পঞ্চম অধ্যায়

নারীর সামাজিক অবস্থান : উপন্যাস ও গল্পে তার প্রতিফলন

নারী প্রগতির চিন্তা বা নারীর স্বাধীনতার চিন্তা-ভাবনার প্রথম পরিচয় আমরা পাই পশ্চিমের দেশগুলিতে। নারীর প্রধান শক্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, যা মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট তাঁর 'ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্‌স্‌ অফ ওম্যান।' 'উইথ স্ট্রিকচারস্‌ অন পলিটিকেল অ্যান্ড মোরাল সাবজেক্টস্‌' বইটিতে ১৭৯২ সালে তিনি নারীর আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে—

> অর্থনীতিটা ছিলো তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ; তাঁর মতে জীবিকা অর্জনের সামর্থ্যই মানুষকে দেয় স্বাধীনতা, তাই যতদিন নারী স্বাধীনতা অর্জন করবে না, ততদিন কোনো স্বাধীনতা অর্জন করবে না। [নারী, পৃ. ২৬৮][১]

তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অনেক বেশি আধুনিক ও প্রগতিশীল। তাঁর 'ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্‌স অফ ওম্যান' বইটিই হচ্ছে নারী মুক্তির সার্বিক প্রস্তাব। এটি থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন ধারার নারীবাদ। এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে হুমায়ুন আজাদ উনিশ শতকের নারীবাদ সম্পর্কে যে মত দিয়েছেন তা যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য—

> উনিশ শতকের নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের সাথে সন্ধি করেই পেতে চেয়েছিলেন অধিকার, এবং তাঁরা মেরির মতো সার্বিক পরিবর্তনে বিশ্বাস করেননি। তাঁরা পেতে চেয়েছিলেন একটু আধটু সুবিধা, আর ভোটাধিকার। [নারী, পৃ. ২৬৯][২]

শুধুমাত্র উনিশ শতক নয়, সমাজে বিভিন্ন সময়ে নারীর অবস্থান আগাগোড়া হুবহু এক ছিল না। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীর জীবনকে রাখা হয়েছে কিছুটা আলোয়, কিছুটা অন্ধকার। যখন সমাজে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা হতে লাগল, তখন থেকে নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হতে শুরু করে। তখন থেকেই নারীর স্বাধীনতা ক্রমশ হ্রাস পেতে আরম্ভ করল। নারীকে ধীরে ধীরে বন্দি করা হচ্ছিল গৃহের অন্তঃপুরে। ক্রমশ নারীকে বোঝানো হয়েছে, গৃহকর্মই হচ্ছে নারীর প্রকৃত কাজ। পরিবারতন্ত্র গঠনের প্রাক্কালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেছে তা ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। নারী তার মনের এবং শরীরের উপর অধিকার হারাতে থাকে। সেই সঙ্গে নারীর জীবনকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। এক—পিতৃগৃহে লালিত জীবন, দুই—বিবাহ পরবর্তী জীবন। নারীর শিক্ষা বিষয়ে সমাজের বিধি বিধানদাতাদের আপত্তি জোরালো হতে থাকে। ধীরে ধীরে সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। সমাজে নারীর ক্রমশ পরিবর্তিত অবস্থার কথা মাথায় রেখে প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর প্রাচীন ভারতে 'নারী ও সমাজ' গ্রন্থে বলেছেন—

> সমাজে নারীর স্থান উনমানবীর, তাকে শুধু ভোগের সামগ্রীরূপে দেখা হতো। তার দেহ, তার শ্রম তার প্রভুর ভোগের জন্য। তাই তাকে বন্ধক রাখা যেত, কেনা যেত, বিক্রি করা যেত, যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে, যৌতুক হিসাবে বা অতিথির উপহার হিসাবে দানও করা যেত। শাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে 'নারী সম্ভোগ আনে।' [পৃ. ৭][৩]

ঋগবেদ ও অথর্ববেদের প্রচুর সূক্তে তার প্রমাণ আমরা পাই। এ সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে অর্থমণ্ডলের ২য় থেকে ৭ম মণ্ডলে আমরা দেখি, গ্রামকেন্দ্রিক যাযাবর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যতটুকু প্রত্যাশা করা যায়, নারী সেই মাত্রাতেই স্বাধীনতা ভোগ করেছে। [প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ. পৃ. ১][৪]

সমাজে যখন পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি, যখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তখন নারী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করত। নারীরাও পুরুষের মতো বহু বিবাহ করার, একাধিক স্বামী গ্রহণ করার অধিকারী ছিল। নারীরা তখন পুরুষের পদানত ছিল না। শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজে তখনও সেইরকমভাবে প্রচলিত হয়নি। ধীরে ধীরে সমাজে যখন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হতে শুরু করে, তখন থেকে নারীরাও শিক্ষা গ্রহণের সাথে নিজেদেরকে একাত্ম করতে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তির সাথে সাথে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর মন্তব্যটি যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য—

> ''মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হলো পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।''** [পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি][৫]

নারী স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট সামাজিক জীব থেকে পরিবর্তিত হরে অন্তঃপুরচারিণী জৈবিক চাহিদা মেটানোর জীবরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। নারী শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়েছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে। যে যন্ত্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বেদ-উপনিষদ বা যে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ নারীকে যতটা না শোচনীয় জীবে পরিণত করতে পেরেছে তার থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের কুসংস্কার। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ-এর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য—

> ''নারী সম্পর্কে যত কুসংস্কার তৈরি করা হয়েছিলো গত কয়েক সহস্রকে, নারীবাদীদের প্রতিবাদে যা হটে গিয়েছিলেন অনেকখানি, তার সবই এ সময়ে ফিরে এসেছিলো ফ্রয়েডীয় ছদ্মবেশে। ফ্রয়েডের জনপ্রিয় বাজারি ভাষ্যকারেরা তা ছড়িয়ে দিয়েছিলো দিকে দিকে। এতোদিন যে নারী ছিলো ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বিকলাঙ্গ আর অধম, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানে সে হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক ভাবে বিকলাঙ্গ আর বিকৃত। ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের কুসংস্কার নারীকে যতোটা শোচনীয় জীবে পরিণত করে, তা করেনি কোনো ধর্মগ্রন্থও। [নারী, পৃ. ১৫৩][৬]

ইসলাম ধর্মের প্রসারের আর্গেজাহিলিয়া' যুগে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের কথা শোনা যায়। এ প্রসঙ্গে আনোয়ার হোসেনের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী' গ্রন্থে মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্যটি খুবই প্রণিধানযোগ্য—

> হজরত মহম্মদের আগেকার 'জাহিলিয়া' বা অজ্ঞতার যুগ থেকে নারীর ওপর চলে আসছিল পুরুষের কর্তৃত্ব। এ যুগে নারী ছিল অধিকারহীন সম্প্রদায়—যৌবনে তারা ছিল পণ্য ও পিতার অস্থাবর সম্পত্তি। বিবাহের পর স্বামী হয়ে দাঁড়ায় তাদের মালিক ও প্রভু। প্রাক্ ইসলামীয় আরবরা নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতাবশত তাদের শিশুকন্যাকে হত্যা করতে, এমনকি জীবন্ত কবর দিতে পিছপা হত না। বহুবিবাহ ও বহুগামিতা সর্বব্যাপী এবং তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল খুবই সহজ ব্যাপার। যুদ্ধ, মদ ও নারী ছিল সে যুগের সামাজিক বৈশিষ্ট্য.....জাহিলিয়া যুগে নারীদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না। কারণ তারা নিজেরাই সমাজে সম্পত্তিরূপে গণ্য হত।'' [পৃ. ১২][৭]

তারপর ধীরে ধীরে সমাজে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। ইসলাম ধর্মের সংস্কারক হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পর ইসলামীয় সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন—

> মহান সংস্কারক হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পর আরবের নারীদের শোচনীয় অবস্থার অবসান হয় এবং মহানবীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমাজে নারীদের একটা মর্যাদাপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠতম নবী নারীজাতির মর্যাদা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হন। তিনি যে বিধিবিধান ঘোষণা করেন তার মধ্যে ছিল শর্তসাপেক্ষে বিবাহ ও অস্থায়ী বিবাহ নিষিদ্ধ করণ, আইনের চোখে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ঘোষণা, পিতার সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তথা উপার্জন করার অধিকার প্রদান এবং শিক্ষার অধিকার দান প্রভৃতি। বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ, শিশুকন্যা হত্যা নিষিদ্ধ, বিবাহে দেন মোহরের প্রবর্তন, নারীদের তালাক বা বিচ্ছেদের

অধিকারদান এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীর অধিকার স্বীকার প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি সামাজিক বিপ্লব ঘটান। [স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী, পৃ. ১৩][৮]

ইসলাম ধর্ম নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দেওয়ার কথা বলেছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলাম ধর্মের প্রসার লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে ভারতবর্ষে আস্তে আস্তে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হতে থাকে। ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রথম নবী হজরত মহম্মদ নারীদেরকে শিক্ষিত করে তুলে সমাজের উপযুক্ত করে তোলার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী' গ্রন্থে আনোয়ার হোসেনের তথ্যটি প্রণিধানযোগ্য—

> ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল বিদ্যাশিক্ষা ও অজানাকে জানার অদম্য স্পৃহা নিয়েই। হজরত মহম্মদ শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য তো করতেনই না, বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।' ইসলামের প্রাথমিক পর্বে অসংখ্য বিদূষী নারীর আবির্ভাব হয়। হজরত মহম্মদের সহধর্মিণী ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী। [পৃ. ১৬][৯]

ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রসারের প্রথমদিকে মুসলিম নারীরা একেবারে অবহেলিত ছিল না। কিন্তু ক্রমশ ভারতের মুসলিম নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। কারণ ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মানুষই ছিল ধর্মান্তরিত মুসলিম। তারা বেশির ভাগই ছিল হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। ভারতীয় হিন্দু সমাজে বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে সমাজে নারীর স্থান ছিল সবচেয়ে উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত। তারপর ধীরে ধীরে নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। নারী তার সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। কারণ পিতৃতন্ত্র নারীকে দেখতে চেয়েছে জননীরূপে। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাছে নারীও মা হয়েই তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির দিক থেকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল নারীকে। এক্ষেত্রে ফ্রয়েড অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—তিনি শুধুমাত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভারই পুরুষের হাতে তুলে দিতে চাননি, মানব প্রজাতিকে রক্ষার ভারও তুলেদিয়েছিলেন পুরুষের ওপর। তিনি নারীকে ভেবেছিলেন সভ্যতার শত্রু হিসাবে। তাই তিনি নারীকে রেখেছিলেন সভ্যতার বাইরে। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

> ফ্রয়েড মানুষের মনোলোকের বৈজ্ঞানিক সূত্র লেখেননি, তিনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাহ্যিক সূত্রগুলোকে মনোবিজ্ঞানের হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন মানুষের মনের সাথে। [নারী, পৃ. ১৫৯][১০]

ধীরে ধীরে পরিবার, ধর্ম, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং প্রচার মাধ্যম নারীকে বিশ্বাস করতে শেখায় সমাজে প্রধান শক্তি পুরুষের হাতেই অর্পিত। তাদের উপরই রয়েছে সমাজের আধিপত্য করার ভার। সমাজই নারীকে ব্যর্থ ও বিকলাঙ্গ করে তুলেছে।

সমাজে নারী-পুরুষ দুটো আলাদা আলাদা জগৎ। পুরুষের জগৎকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। সেই ভাগ দুটোর মধ্যে একদিকে রয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষ। আর অপর ভাগটিতে রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের পুরুষ। কিন্তু নারীর জগতে নারীরাই বিচরণশীল। তাদের হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ে ভাগ করা যায় না। কারণ সমাজে সব সম্প্রদায়ের নারীরাই বঞ্চনার শিকার। এই ভাবনাটিকেই লেখক গৌরকিশোর ঘোষ 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে সমাজে নারীর অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ফুলকির [অমিতা] মুখ দিয়ে প্রায় একই কথা বলিয়েছেন—

> সব মেয়েরাই সমান অসহায়। তুমি পুরুষ শামিম তাই জান না। পুরুষের জগতে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে। কিন্তু মেয়েদের জগতে শুধু মেয়েরাই আছে। তারা হিন্দু নয়, তারা মুসলমান নয়। তারা শুধুই মেয়ে। সব বঞ্চনার তারাই শিকার। [পৃ. ২৬৭][১১]

হিন্দু-মুসলিম যে কোনো সম্প্রদায়ের নারীরা আজ পুরুষতন্ত্রের দাসে পরিণত হয়েছে। নারীকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে গৃহের এক কোণে বন্দি করে রাখা হয়েছে। শিক্ষার আলোকে নারী সত্তার জাগরণ ঘটানো আমাদের সমাজে সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে। নারীর শিক্ষার শোচনীয় রূপটি বেশি করে প্রকট হয়ে দেখা

দেয়। কিন্তু মুসলিম সমাজের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান-এ নারী শিক্ষার কথা উল্লেখ যেমন আছে, একই সঙ্গে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেই জায়গাগুলোকে অতি সন্তর্পণে কাহিনির মধ্য দিয়ে এনে সমগ্র পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক—তাঁর প্রতিবেশী উপন্যাসে শামিম ও ফুলকির বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে বারবার 'কোরান'-এ নারীর অবস্থানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শামিম ইসলাম সমাজে নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

> ইসলাম নারীজাতিকে পায়ের শিকল কেটে মুক্ত করে দিয়েছে। একমাত্র ইসলামই নর ও নারীর জন্য সমান বিধান দিয়েছে। পুরুষ যদি নারীর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে চায়, তবে পুরুষও নারীকে ততখানি দিতে বাধ্য। এ আমার মনগড়া কথা নয় ফুলকি। কোরানে বলা আছে। [প্রতিবেশী, পৃ. ২৫২][১২]

কোরানে নারীর অধিকারকে পবিত্র বলে আখ্যা দিয়েছে। তাতে কারো হস্তক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'নারী পুরুষেরই অংশ।' 'নারীকে সম্মান কর, কেন না নারী পুরুষের জননী, ভগ্নী, স্ত্রী এবং নিকট আত্মীয়।' ইসলামীয় এই ধর্মগ্রন্থ সমাজের পুরুষ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছে—''তোমরা আপন স্ত্রীকে ঘৃণা করিও না। যদি তোমার স্ত্রীর একটি দোষে তুমি বিরক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তাহার অপর একটি গুণের জন্য আনন্দিত হও।" [পৃ. ২৫৪][১৩]

কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজে ধর্মের বন্ধন জোরালো হতে থাকে। ধর্মের ভয় দেখিয়ে সমাজের সমাজপতিরা নারীকে পুরুষের পদানত করে রাখতে চাইলেন। তাঁরা বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থগুলির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাতে লাগলেন এবং তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করতে লাগলেন। ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলে প্রচার করতে লাগলেন। আর তাঁরাই ঠিক করে দিতে লাগলেন সমাজে নারীর স্থান কোথায় হবে, নারী শিক্ষার আলো গ্রহণ করতে পারবে কিনা, যদিও শিক্ষার আলো গ্রহণ করতে পারে তবে তা বিদ্যালয় শিক্ষা হবে কিনা প্রভৃতি এই সমস্ত বিষয়ে তাঁরাই সিদ্ধান্ত দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে নারীকে তাঁরা পঙ্গু করে তুলতে লাগলেন। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া বলেছেন—

> ''আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশমাত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।.....পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে [অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত সহোদরদিগকে] এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়।....তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। [প্রতিবেশী, পৃ-২৫৪][১৪]

সমাজের সমস্ত নির্যাতিত নারীর কথাই বেগম রোকেয়া ফুটিয়ে তুলেছেন। বেগম রোকেয়ার কথার সূত্র ধরে ফুলকি নিজেই নিজের মনে মনে গর্জে উঠেছে—বলেছে—

> যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ সতীদাহ। [পাদটীকা ঃ্ব একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার শতাধিক পত্নী সহমৃতা হইতেন কী] যেখানে ধর্মের বন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। এস্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।" [প্রতিবেশী, পৃ. ২৫৪-২৫৫][১৫]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর জীবনকে শুধুমাত্র গৃহের অভ্যন্তরেই বন্দি করেনি, একই সঙ্গে তাদের জীবনকে কতকগুলি পর্যায়ের মধ্যে বেঁধে দিয়েছে। তার প্রতিটি পর্যায়ই পুরুষদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে নারীর স্বাধীন সত্তা বলে আর কিছুই রইল না। নারীকে পুরুষ মুখাপেক্ষী করে তোলাই পুরুষতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য আর সেই কাজে পুরুষ প্রধান সমাজের বিধি-বিধান দাতারা বিশেষভাবে সফলতা লাভ করেছেন। সমাজের বিধি-বিধানদাতারা হিন্দু-নারীদের জন্য মনু যে

অমোঘ বিধানের ছক বেঁধে দিয়েছেন সেটাই তাঁরা বারবার করে সাধারণের প্রত্যক্ষ গোচর করার চেষ্টা করে গেছেন। আর এই বিষয়টিকেই লেখক সূক্ষ্ম কৌশলে কাহিনির মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন—

> শৈশবে নারীরা পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। মনু হিন্দু নারীদের জন্য এই অমোঘ ছক বেঁধে দিয়েছেন। [প্রতিবেশী, পৃ. ৫৯][১৬]

ধীরে ধীরে সমাজের মূলে গভীরভাবে এই ধারণাই প্রোথিত হতে থাকে। নারীর অবস্থান বার বার পরিবর্তিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গটি লেখক 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসে গিরিবালা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

> এ এক আশ্চর্য অবস্থা তার। ছিল এক গিরিবালা, যখন সে জন্মাল তখন থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত গিরিবালা তো একটাই ছিল। এক ঘর, একটি পরিবার জুড়েই তার যা কিছু ধারণা গড়ে উঠেছিল। সে তখন দেওয়ান বাড়ির মেয়ে। ওই একটি বাড়ির সুখে তার সুখ, দুঃখে তার দুঃখ, একটি বাড়ির আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই তার আশা তার আকাঙক্ষার ছিল লেনদেন।
>
> যেই তার বিয়ে হল, গিরিবালা দেখল, সে অমনি দুটো বাড়ির মানুষ হয়ে পড়ল।...বিয়ের আগে গিরিবালা যেন ছিল ফোয়ারা, একটি ছিল তার আধার। বিয়ের পর গিরিবালা হয়ে উঠল নদী, দুদিকে তার দুটি তীর। একটি বাপের বাড়ি, আর একটি শ্বশুড় বাড়ি। [পৃ. ৪০][১৭]

গিরিবালা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর চরম অবস্থাকে যেমন তুলে ধরেছেন, তার পাশাপাশি গিরিবালার নিজের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সমগ্র নারীর উপলব্ধিই প্রকাশ পেয়েছে। ''গিরিবালা নিজেই দুটো গিরিবালা হয়ে গেল—খোকার মা আর ভূষণের বউ।" [পৃ. ৪০][১৮] সমাজে আমরা নারীকে সবসময়ই দুটি রূপে দেখতে পাই। জননী রূপে ও প্রেয়সী রূপে। মাতৃরূপে নারী সর্বজন বন্দিত। পাশাপাশি নারীর অন্যরূপটিও সমাজে সর্বত্র বিস্তৃত। তাই লেখকের অপর আরেক উপন্যাসের নায়িকা অমিতাকে [ফুলকি] নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে বলতে শোনা যায় যে ''বিবাহ হলে কন্যা স্বামীর সম্পত্তি।"...। সমাজ নারীর জননী রূপের উপরই বেশি গুরুত্ব দান করেছে বার বার। যে নারী যত বেশি সন্তান উৎপাদন করতে পারে সমাজে তার কদর সবচেয়ে বেশি। তাকে সমাজে ভগবান জ্ঞান করা হয়। আর সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে 'জলপড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসের তাঁতি বউ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে—''এ অঞ্চলে তাঁতি বউয়ের খুব সুনাম। আট দশটা ছেলে পুলের মা।" [পৃ. ২৪][১৯]

বিশ শতকে বিজ্ঞানের সফলতম সময়ে দাঁড়িয়েও আমরা দেখতে পাই নারীর অবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ 'বিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে ছড়িয়ে আছে কুসংস্কার।' যার সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য হল নারীকে আরো বেশি করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের খেলার পুতুলে পরিণত করা। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের নায়িকা 'অমিতা' [ফুলকি] মন্টুর মাকে নিজের জীবনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে পাঠক সমাজকে এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সে বলছে—

> মজা কি জানো মন্টুর মা, খোকার বাবা একটা মেয়ে চেয়েছিল। ছেলে হলে খানিকটা বিরক্ত হয়েছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অমিতা। সে যেন একটা ফ্যাকটরি। মেয়ে চাও মেয়ে পেয়ে যাবে। যেন কল টিপলেই জল। ছেলে চাও ছেলে পাবে। এখন আবার ফ্যাশন বদলেছে। কি সব যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, গর্ভে যন্ত্র বসিয়ে জেনে নেওয়া যাবে সেখানে ছেলে আছে না মেয়ে আছে। মেয়ে যদি থাকে, তবে তাকে নষ্ট করে দাও। কোথায় যাচ্ছে দুনিয়া? হা! [পৃ. ৬৪][২০]

বিশ শতকে এসেও নারী শিক্ষার আলো সঠিকভাবে পায়নি ফলে নারীর অবস্থার উন্নতি সেই রকমভাবে লক্ষ করা যায় না। নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য সমানভাবে বজায় ছিল। বরঞ্চ সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরো দৃঢ় হতে থাকে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর উপর কোনো রকম স্বামীত্ব আরোপিত হয়নি। কিন্তু সেই সমাজ ব্যবস্থা যখন থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে, তখন থেকে নারীর অবস্থান হল অন্তঃপুরে। লিঙ্গভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান ক্রমশ গৃহাভিমুখী হতে থাকে। সেখানে নারীর প্রধান ভূমিকা হয়ে ওঠে স্ত্রী ও জননীরূপে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে, বিশেষ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের নারীদের উপর আরোপিত হয়েছিল সমাজের নানা ধরনের সংস্কার। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথার প্রসার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুলীন সমাজের কৌলীন্য প্রথা বজায় রাখতে নাবালিকা কন্যাদের তাদের বয়সের দ্বিগুণ পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। এর ফলস্বরূপ সেই সমস্ত মেয়েদের খুবই অল্প বয়সে অর্থাৎ যৌবনে প্রবেশ করার আগেই বিধবার বেশ ধারণ করতে হত। এরপর তাদের উপর চলত সমাজের নানান বিধি নিষেধ ও কুসংস্কার। সেই চিত্রও লেখক তাঁর 'জলপড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন—

> ফেদির বিয়ে হয়েছে তিন বছর। দু'বছর সে বিধবাই হয়েছে।....কিন্তু বছর না ঘুরতেই কপাল পুড়ল তার, সিঁথির সিঁদুর, শাঁখা, লোহা—এয়োতির সমস্ত চিহ্ন ঘুচিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এল ফেদি। এক ফুঁয়ে কে যেন ভাগ্যের প্রদীপ নিবিয়ে দিল। জীবনটা যদি নিবিয়ে দিতে পারা যেত। [পৃ. ১১৯-১২০][২১]

তারা নিজেদের মনের কামনা বাসনাকে দেহের আশ্রয়ে পঙ্গু করে রাখে এবং নিজেদেরকে এক বর্ণহীন গন্ধহীন স্বাদহীন দীর্ঘ কঠোর সাধনার জন্য তৈরি করে। ফেদির মতো মেয়েদের দেহের পঙ্গু হয়ে আসা কামনা-বাসনা কোনো সময় পর পুরুষের দ্বারা তাড়িত হয়ে থাকে। যেমন 'জলপড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসটিতে ফেদি সুধাময়ের কামনায় তাড়িত হয়ে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে।

> ফেদি কোনও কথা না বলে থরথর কম্পিত হাতে সুধাময়ের হাত ধরে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঝনাত করে বাইরের শিকলটা শব্দ করে উঠল। তারপর বন্ধ কপাটের গায়ে মৃদু মৃদু দুলতে লাগল শিকলটা। [পৃ. ১২৮][২২]

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহের মতো পণ প্রথাও ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পণপ্রথার জন্যই কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের মতো সংস্কার ও বিধিগুলি সমাজের বুকে রমরমিয়ে চলছিল। পণপ্রথার শিকার বহু নারী ও তাদের পরিবার। সমাজের সেই জঘন্য প্রথাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক গৌরকিশোর ঘোষ। তৎকালীন বাংলার গ্রামগুলোতে গৌরী দান প্রথার প্রচলন ছিল। অর্থাৎ মেয়েদেরকে বারো-তেরো বছরের আগেই বিয়ে দেওয়া হত। নইলে গ্রামে 'গেল গেল' রব উঠতে থাকে। যার জন্য কন্যার পিতাকে অন্নজল ত্যাগ করে পাত্র খুঁজতে বেরতে হয়। তার উপর মেয়ের গায়ের রঙ যদি কালো হয় তাহলে পাত্র পক্ষের পণের মাত্রা আকাশ ছোঁয়া হতে থাকে। সেই চিত্রই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসের ভূষণের পরিবারের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

> এই গ্রামের আরেকটি মেয়ের বিয়ের ফুল ফুটল। চম্পি খবরটা যেন তার মনকেই দিল। হুস করে দীর্ঘশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। কাদের মেয়ের বিয়ে? কলু পাড়ার কাউকে সে চেনে না, তাই বুঝতে পারল না। নিশ্চয়ই সে আমার চেয়ে ছোট। কলুরা খুব ছোট ছোট মেয়ের বিয়েই দেয়। বড়দিরও খুব ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছে, গৌরীদান করেছিলেন বাবা। মেজদির বয়েস তেরো পেরোতেই গ্রামে 'গেল গেল' রব উঠেছিল নাকি। বাবা অন্নজল ত্যাগ করে পাত্তর খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। ভাল একটি জমি বিক্রি করতে হয়েছিল মেজদির বিয়েতে। তাইতে মেজকাকা খুব রাগ করেছিলেন। অনেকদিন ধরে ঝগড়াঝাঁটি, অশান্তি চলেছিল। সেজকাকা বা ছোটকাকার মতো নন মেজকাকা। পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁর অধিকারবোধ প্রবল, ভাগের টাকার অধিকার তিনি শেষ পর্যন্ত ছাড়েননি। তাই ছোটকাকার বিয়েতে পণ নিয়ে সেই টাকা মেজকাকাকে দিয়েছিলেন বাবা। আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সম্পত্তি বেচে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।" [পৃ. ১৭৫][২৩]

তাই চম্পির বিয়ে দেবার জন্য তার বাবার আর তেমন উৎসাহ লক্ষ করা যায় না। কিন্তু চম্পিকে নানা ধরনের গঞ্জনার মুখোমুখি হতে হয়—

চম্পি অভাগী বই কী? এই গ্রামে অব্যিয়েত আর কোনও মেয়ে নেই। তার বয়সি যে মেয়েরা ছিল, কবেই তাদের সিঁথেয় সিঁদুর উঠেছে। অনেকের কোলে ছেলেমেয়েও এসে গেছে। একমাত্র তারই কোনও গতি হল না। তার চেয়ে ছোট অনেক মেয়ে ছিল এই গ্রামে। তাদেরও অনেকে পার হয়েছে। তাদের মা কাকিরা ঘাটে আসে। ঠেস দিয়ে অনেক কথা শোনায়। মা'র কানে সে সব কথা গেলে চম্পির লাঞ্ছনার আর অন্ত থাকে না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭৬][২৪]

তাই শেষ পর্যন্ত বছর চল্লিশের বগলাকান্তের সঙ্গে বছর পনেরোর চম্পির বিয়ে ঠিক হয়। শেষ পর্যন্ত বিয়েটি ঠিকভাবেই সম্পন্ন হয়। অর্থের বিনিময়ে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা অসম বিবাহে সম্মতি দান করে। অন্যদিকে নারীদেহ লোলুপ বগলাকান্তের মতো মানুষেরা অর্থের বিনিময়ে নারীর দেহকে ভোগ করতে চায়। সে চিত্রও উপন্যাসটিতে দেখতে পাওয়া যায়—

কোনও অভাবই রাখব না তুমার। কত শাড়ি চাও, কত গয়না চাও। বগলা বিশ্বেসের অভাব নেই কিছু। তার যা কিছু আছে, সবই তো তুমার। আমি তো এখনও চরণের দাস। দেহি পদপল্লব মুদারম। হেঁ হেঁ হেঁ। বুঝিছ। হেঁ হেঁ। যে মুহূর্তে তুমারে দেখিছি, সেই তখনের যেই কিনা গুলাম হয়ে গিইছি। বেশ শরীর খান তুমার। এই রকমই আমার পছন্দ। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। বুড়ো বলে ব্যাজার হইছ নাকি? পুরনো চাল আর পুরনো বর, ওই যে কী যেন বলে, হেঁ হেঁ হেঁ, তাই। বুঝিছ। আসো, আসো কাছে আসো। ভাবতিছ বুড়ো বর, আরে বুড়ো কি বয়েসে করে?

বলেই চম্পিকে আবার কাছে টেনে নিলেন। তাঁর বুকের ঘাম চম্পির মুখে ঠেকল। আগ্রহ দেখাল না সে। বিন্দুমাত্র বাধাও দিল না।

বগলাকান্ত বাবু সেই রাত্রেই স্বামিত্বের স্বাক্ষর রাখতে যখন অতিমাত্রায় উদ্যোগী হয়ে উঠলেন, চম্পি তখনও বাধা দেয়নি। সে বুঝেই গেছে এখানে তার ইচ্ছা অনিচ্ছা অবান্তর। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২১১][২৫]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কখনোই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেখানে নারীকে পুরুষের দাসী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। বিনা অর্থ ব্যায়ে সামান্য কিছু খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময়ে নিজেদের ঘর ও সন্তান-সন্ততি দেখাশুনার লোক তারা পেয়েছিল। তাই নারী আজ সরব হতে চাইছে এই প্রথার বিরুদ্ধে। নারী আজ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তাও কোথাও যেন সে পুরুষতন্ত্রের দ্বারা চালিত। এ প্রসঙ্গে আনোয়ার হোসেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি হিন্দু সমাজের নারীর ভাগ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। বিদ্যাশিক্ষার অধিকার লাভে, সামাজিক অধিকার প্রাপ্তিতে এবং পেশাগত ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রাপ্তিতে তা স্পষ্ট। এই শতকের আটের দশক থেকে এদেশের সমাজে নারী শ্রদ্ধার পাত্র—নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটে। তবে পুরুষতন্ত্র নারীকে যে তার স্থান পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে তা নয়। পুরুষের হাত ধরেই নারীকে মুক্তির মঞ্চে উপস্থিত হতে হয়েছে। [স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী, পৃ. ৪৭][২৬]

স্বাধীনতার সমসাময়িক সময়ের বাংলার হিন্দু-মুসলিম নারীর অবস্থান্তর দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, নারী কতটা পুরুষতন্ত্রের পদানত। বিশেষ করে বাংলার মুসলিম নারীরা। ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলিম নারীর জাগরণ ঘটেছিল অনেক পরে। বাংলার নারী জাগরণের উপর পাশ্চাত্যের নারীমুক্তির আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। বাংলা তথা ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্যের সামাজিক আন্দোলন, নারীশিক্ষা, ভোটাধিকার প্রভৃতি আন্দোলন। মুসলিম সমাজের মোল্লা-মৌলভীরা হাদিস শরিফ ও কোরানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে অর্থাৎ ধর্মের নামে জিগির তুলে নারীকে পর্দানসীন করে গৃহে বন্দি করে রেখেছিলেন। মুসলিম নারীর সমাজে দুরবস্থার আরেক প্রধান কারণ হল, মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ নারী অগ্রগতির জন্য কোনো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেননি। মুসলিম নারীরা ছিল মুক্ত আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত। বরং তারা অশিক্ষা, কুংসস্কার, অবরোধ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ তালাক

প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত ছিল। মুসলিম সমাজে পুরুষের স্থানই মুখ্য। নারীর স্থান তার পদতলে। তাই সমাজপতিরা নারীদেরকে ভয় দেখায় যে, যদি তারা স্বামীর মুখে মুখে তর্ক করে তাহলে আর আওরতে হাসিনা হতে পারবে না। তখন তাদের দোজখের আগুনে পুড়ে ভাজা ভাজা হতে হবে এবং নেক্‌কার স্ত্রীলোকে পরিণত হতে হবে। মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান সুবিস্তৃত পরিসরে বর্ণনা করেছেন লেখক গৌরকিশোর ঘোষ। 'প্রেম নেই' উপন্যাসটিতে স্বাধীনতার সময়কালের ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি উঠে এসেছে তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও নারী-পুরুষের অবস্থান। উপন্যাসটিতে 'বিলকিস' একজন মুসলিম তরুণী। তার এবং তার আশেপাশের নারীর অবস্থানটিকে কাহিনির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন লেখক। মুসলিম সমাজের মৌলবিদের দ্বারা তৈরি কিছু কুসংস্কার সেই সমাজের নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করে। 'প্রেম নেই' উপন্যাসে লেখক সেই সমস্ত নারীদের জীবনকেই ঘটনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তার কয়েকটি নমুনা আমরা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। মৌলবিরা নারীদের মনে এক ধরনের বিশ্বাস জাগাতে থাকে যে—যে কোনোভাবে, সব রকম অবস্থাতে স্বামীর সেবা করলে মৃত্যুর পর মেয়েরা স্বর্গে অর্থাৎ বেহেশ্‌তে থাকতে পারবে। বেহেশতের নাম করে নারীদেরকে দিয়ে পুরুষের যে সমস্ত কাজ করতে বাধ্য করত তা শুধুমাত্র নিন্দনীয়ই নয়, ঘৃণিতও বটে। তা টগর ও বিলকিস্‌-এর কথার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়।

> ...আওরতে হাসিনা হওয়া কি, বিলকিস্‌ ঠেস দিয়ে বলল, ''অতই সুজা? যদি কোনও সোয়ামীর শরীল থেকে পুঁজ রক্ত সব সুমায় বেরোতে থাকে তবে তার বিবি যদি নেককার হতি চায় তবে সেই বিবির সেইসব পুঁজ রক্ত জিভ দিয়ে চাটে সাফ করে দিতি হবে।" [প্রেম নেই, পৃ. ২][২৭]

'প্রেম নেই' উপন্যাসে ফকির নিজের বচনের মধ্য দিয়ে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কর্মের নির্দেশ মতো পালন না হলে কি হতে পারে, তার বিবরণ দিয়েছেন—

> ''কোরানের বাণী আর নবীর চেন।
> মন প্রাণ দিয়া আরও শুন বিবি গণ।।
> যে বিবি পতির মনে কষ্ট কভু দিবে।
> কেঁদে কেঁদে দোজখেতে যাপন করিবে।।
> শত শত সাপ বিচ্ছু কাটিবেক তথা।
> দিবানিশি আগুনেতে জ্বলিবেক সেথা।।
> আরও কত কষ্ট তার নাহিক শুমার।
> সে সব কষ্টের কথা কি বলিব আর।।' [পৃ. ৬][২৮]

নারীকে যাতে দোজখেতে যেতে না হয় তার জন্য সে বলেছে—

> দেল জান দিয়া তাঁর মন যোগাইবে।
> পতিরে প্রাণের চেয়ে মমতা কবিবে।।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৬][২৯]

অন্য দিকে হিন্দু সমাজের নারীরা তাদের সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় করার জন্য এবং মরবার সময় যাতে স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান পালন করে চলে সারা জীবন ধরে। সেই সমস্ত কিছু ব্রতের কথা উঠে এসো গৌরকিশোরের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটিতে।

> ''পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজেরে সকালবেলা।
> আমি সতী পুত্রবতী সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী।।
> ঢালি জল তুলসী বিল্বে স্বামী আদরিনী হব ফলে ফুলে
> পুণ্যিপুকুরে ঢালি জল শ্বশুর কুলের হোক মঙ্গল।।
> এ ব্রতের ফল কি হয় নির্ধনের ধন হয়
> সাবিত্রী সমান সতী হয় স্বামী সোহাগিনী হয়
> পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে মরণ হবে গঙ্গাজলে।।" [পৃ. ২১৩][৩০]

কিন্তু এই সমস্ত ব্রত পালন করেও যে শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না তা সুধাময়ের মায়ের [বুড়ি] কথার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সে নিজের জীবন দিয়ে সমাজের যে কঠিন সত্যকে উপলব্ধি করেছিল, তা তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

> ''পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজেরে ভোরের বেলা—কে আবার? সেই কাকভোরে উঠে আমারাই পূজেছিলাম। পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে মরণ হবে গঙ্গাজলে। কাঁচকলা। এ বেতর ফল হল কি? স্বামী আমার কোলে সংস্কার রেখে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন।" [পৃ. সমগ্রন্থ ২১৩][৩১]

এই ছিল স্বাধীনতা সমসাময়িক ও স্বাধীনতা পূর্ববর্তী হিন্দু-মুসলিম সমাজের নারীর অবস্থান। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে গ্রামে নারীদেরকে গৃহবন্দি ও পর্দানসীন করে রাখাই ছিল পুরুষপ্রধান সমাজের প্রধান লক্ষ্য। তাই নারীকে গৃহবন্দি করে রাখার প্রধান পথ হিসেবে তারা বেছে নিয়েছিল ধর্মকে। ধর্মের ভয় দেখিয়ে নারীকে তারা শিক্ষার আলো থেকে, জ্ঞানের আলো থেকে বিশেষ করে বহির্বিশ্ব থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে সেই সময় ভারত তথা বাংলায় শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন। আর এই আন্দোলনের ঢেউ কলকাতায় আছড়ে পড়েছিল। কলকাতায় সেই সময় হিন্দু ও মুসলিম সমাজের জাগরণ লক্ষ করা গেছে। কলকাতায় সেই সময় মুসলিম সমাজের নারীদের মধ্যে শিক্ষার উন্মেষ কিছুটা হলেও লক্ষ করা গেছে। 'বিলকিসের' স্বামী ফটিকের অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা লক্ষ করা যায়—

> কলিকাতায় আসিয়া দেখিতেছি মুসলিম সমাজে বেশ জাগরণ হইতেছে। আপনি যদি পারেন আপনার কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবেন। বিদ্যা আমাদের চক্ষু স্বরূপ, ইহা ক্রমেই বুঝিতেছি। উহা যত আমল হইবে দুনিয়াকে ততই সাফ দেখা যাইবে। [সমগ্রন্থ পৃ. ৬][৩২]

তৎকালীন মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারটি মেনে নিলেও তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেনি। মৌলভী সাহেবরা মুসলিম সমাজের নারীদের শুধুমাত্র উর্দু ও আরবি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দান করেছিল। তাদের মতে—

> ''মুসলমানের মেয়ে আরবি পড়বে না তো পাক্ কোরান তেলায়েত করবে কি করে? [সমগ্রন্থ পৃ. ৯][৩৩]

সেই সময় মুসলিম নারীদেরকে শুধুমাত্র কোরান হাদিস পাঠের জন্য বাড়িতে বসে উর্দু ও আরবি ভাষায় লেখা পুস্তক পাঠের অনুমতি মিলেছিল। বাংলা ভাষায় লেখা গ্রন্থ পাঠ করা থেকে মুসলিম নারীদেরকে বিরত করে রাখা হয়েছিল। স্কুল-কলেজে যাওয়ার অনুমতিও সমাজ তাদেরকে দেয়নি। এই বিষয়টিকে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে রেশমা'র শিক্ষা গ্রহণের কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। রেশমার শিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে শামিমের অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন মুসলিম সমাজের কুৎসিত রূপটি ফুটে উঠেছে—

> কৃষ্ণনগর থেকে যখন আসতাম বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ,দ্বিতীয় ভাগ, বোধোদয়, কথামালা এনে দিতাম রেশমাকে। বাড়ি এসে শুনতাম, মৌলবী ওসব পড়তে বারণ করেছেন। একদিন রেশমাকে বললাম, তুই কি পড়িস দেখি? রেশমার কোরান পড়ার ততদিনে বেশ এগিয়ে গিয়েছে। এখন দেখলাম। বললাম, আর কিছু তুই পড়িস না? রেশমা বটতলার ছাপ অনেকগুলো পাতলা পাতলা বই এনে দেখাল। ওঁরা বলেন, পুঁথি। অদ্ভুত সব বই ফুলকি।আমি কোনওদিন যার নামও শুনিনি। শাহনামা,আমীর হামজা, আলেফ লায়লা,চাহার দরবেশ,কাসাসুল আম্বিয়া, শহীদে কারবালা, জঙ্গনামা, কেয়ামতনামা, গোলে বাকাউলি। এ সব কী!" [পৃ. ২৬৫][৩৪]

অন্যদিকে রেশমা নিজে বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধেযে কথা বলেছে তা তৎকালীন মুসলিম সমাজের মূলের কথা।—

> বাবার ধারণা ছিল, ইস্কুল কলেজে পড়লে আমি আর আল্লাহ্‌র পথে থাকব না। ইংরাজি শিক্ষা শয়তানের শিক্ষা। সেই শিক্ষা নিলে আমার মধ্যে হিন্দুয়ানি বেড়ে যাবে।....বাবা আমাকে মক্তব মাদ্রাসায় পড়িয়ে মৌলানা বানাতে চেয়েছিল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৯][৩৫]

অর্থাৎ এই ছিল তৎকালীন গ্রাম্য সমাজ। যে সমাজ নারীকে নির্দিট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল, 'সাধ্বী স্ত্রী পুরুষের হুকুম মত চলিবে।' বাংলার গ্রাম সমাজের এই রকম পরিস্থিতিতে 'প্রেম নেই' উপন্যাসের ফটিক যখন গ্রামীণ সমাজের গণ্ডি কেটে কলকাতার বৃহত্তর গণ্ডিতে এসে পড়ল,তখন তার পুরাতন বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে ক্রমাগত ঘা দিতে লাগল। তখন সে গ্রাম ও শহরের নারীর অবস্থানের মধ্যে এক বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করতে লাগল। সেই সময় শহর কলকাতা ও মফসসলের চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রে তখন দীক্ষিত হয়েছিলেন কিছু নারীও। স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন যে সমস্ত নারী, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তাছাড়া সেই সময় আরো কিছু মহীয়সী নারী এগিয়ে এসেছিলেন নারী জাগরণের আশায়। অর্থাৎ নারীর পুনর্জন্ম প্রতিষ্ঠার আশায়। এই সমস্ত নারীরা কোনো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়নি। তঁদের প্রতিবাদের ভাষা ঝড়ে পড়েছিল তাদের লেখনীর মধ্য দিয়ে। এই সমস্ত নারীদের মধ্যে মুসলিম নারীরাই ছিল অগ্রগণ্য। দেশের স্বাধীনতার উত্তালময় পরিস্থিতিতে নানা পত্র-পত্রিকায় নিজের দেশের ও চারপাশের নারীদের অবস্থান লক্ষ করে বিভিন্ন প্রতিবাদমূলক লেখালেখি তাঁরা শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মিসেস রোকেয়া এস রহমান, ওমদা তুন্নেছা খাতুন, ফিরোজা বেগম, বদরুন্নেসা খাতুন, মিসেস এম. রহমান, মিস ফজিলতুন নেসা এম এ, সৈয়দা জয়নব খাতুন, নরুন্নেচ্ছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এই সমস্ত মহীয়সী নারীরা মহিলা সওগাতে তাদের মনে কথা লিখে নারী জাগরণের ভিতকে মজবুত করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সমস্ত ঘটনার বিবরণও আমরা পাই গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস 'প্রেম নেই' ও 'প্রতিবেশী'-তে। বেগম রোকেয়া বুঝতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের নারীদের ধর্মের ভয় দেখিয়ে তাদের পুরুষের পদানত করে রাখা হয়েছিল। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি লিখেছেন—

> যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নতমস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। [প্রেম নেই,পৃ. ১০][৩৬]

তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমাজপতিদের তৈরি করা নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বলেছেন—

> যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জলবায়ু তো সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন?" [সমগ্রন্থ পৃ. ১০৭][৩৭]

মোল্লা-মৌলভিরা মুসলিম সমাজের মেয়েদেরকে যেভাবে অধঃপতিত করে রেখেছিলেন সে সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন কয়েকজন সাহসিকা মুসলিম লেখিকা। মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মহিলা 'সওগাতে' ফিরোজা বেগম বলেছিলেন—

> বাঙ্গালার নারীদের শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রতিবন্ধন মোল্লা সমাজ। শিক্ষার আলোক পাইলে নারীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে, পতিভক্তি কমিয়া যাইবে—মোল্লাদের এ সমস্ত আশঙ্কা অমূলক, তাহারা এ কথা ভাবিয়া দেখেন না যে, নারীজাতিকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হইলে তাঁহারা শুধু উপযুক্ত গৃহিণী বা উপযুক্ত মাতা হইয়া উঠেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত পরামর্শ দাত্রী ও সত্যকার সহধর্মিণী হইয়া উঠেন। [প্রতিবেশী, পৃ. ২১৯][৩৮]

এ সম্পর্কে মহিলা সওগাতে বদরুন্নেসা খাতুন বলেছিলেন—

> মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কতর্ব্য। আল্লাহ্তালা মানুষকে বুদ্ধি বলে একটা জিনিস দিয়েছেন। এই বুদ্ধি বা বিবেক জিনিসটাকে জ্ঞানচর্চার দ্বারা যতই মাজাঘষা করা যায় ততই এর উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির যেরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ হয়, এমনটি আর কিছুতে হয় না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৯][৩৯]

সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি নারীর অধঃপতিত অবস্থা এবং নারীর মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে প্রতি পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছে। আমাদের এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে অনেক জাতির উত্থান-পতন হয়েছে। নূতন নূতন চিন্তাভাবনার উদ্‌ভাবন হয়েছে, নূতন নূতন আবিষ্কার হয়েছে, পুরাতনের স্থান অধিকার করেছে নূতনেরা। কিন্তু আমাদের দেশে নারীর অবস্থা আবহমান কাল থেকেই একই রয়ে গেছে। 'নারী চিরকালই মূর্খ ও হেয়।' সমাজের গুরু-পুরুতরা এতদিন ধরে মেয়েদের সম্মান নিয়ে যা ভেবে এসেছেন তা তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে ফুটিয়ে তুলেছেন 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটিতে—সুধাময়ের মা [বুড়ি]তার বউকে যখন বলে—

> তারা বলে তোমরা দেবী, তাদের বাড়িতে কখনও উঁকি দিয়ে দেখেছ বউমা? বাড়ির মেয়েদের উদয়স্ত খাটতে খাটতে যে আয়ুক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, ভ্রূক্ষেপও নেই মদ্দরের। কচি কচি মেয়ে বিয়ে হয়ে ঘরে এসেছে, তারপর থেকেই বিয়োতে বিয়োতে হাড্‌ডি সারা হয়ে যাচ্ছে। সূতিকায় মরছে, যক্ষ্মায় মরছে। ওর মধ্যে যারা বিধবা তাদের তো মানুষ বলেই জ্ঞান করা হয় না। আবার বলে নাকি 'অর্ধনারীশ্বর। তার আবার আধখানায় [নারী] কাছাখোলা, আর বাকিআধখানায় [নর] কাছাকাছো আঁটা। আহা হা কী ছিরি। [পৃ. ২২০][৪০]

অন্যদিকে ইসলাম ধর্মও নারীদেরকে কারাপ্রাচীরে অবরুদ্ধ করে রাখতে বা জড় পুত্তলিকার মতো গৃহসজ্জার উপকরণ করে গৃহের কোণে আবদ্ধ রাখতে বলেনি। বরং ইসলাম ধর্ম নির্দেশ দিয়েছে নারীর জ্ঞানলাভ অবশ্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে সুধাময়ের বাবার বলা কথাটি বেশি প্রণিধানযোগ্য—

> যে সংসারে মুখ্যু মেয়েলোক থাকে সে সংসারে ভাষ্যি থাকে না। [প্রতিবেশী, পৃ. ২১৯][৪১]

দিকে দিকে আজ সমস্ত নারীর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংগ্রাম করার যে প্রধান অস্ত্র শিক্ষা ও জ্ঞান, তাই তাদের নেই। আজ তাদের মধ্যে আছে কেবল আত্মগ্লানি, মর্মভেদী অনুশোচনা আর সর্বোপরি মুক্তির জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। আর তার জন্য তাদের সবার প্রথম দরকার শিক্ষা। যে শিক্ষা তাদের মনকে উন্নত ও প্রশস্ত করে, বিবেক বুদ্ধিকে সুমার্জিত ও সুচালিত করে, যে শিক্ষা ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা বোধ গঠন করার উপযোগী শক্তি দেয়। আর সেই শিক্ষা থেকেই বাংলার পল্লীর হিন্দু ও মুসলিম নারীরা বঞ্চিত। তারা আজ স্পন্দনহীন। 'তারা যেন ধরার বুকে মূর্ত অভিশাপের হৃদয় বিদারক মূর্তি।'এ প্রসঙ্গে সৈয়দা জয়নব খাতুন মহিলা সওগাতে বলেছিলেন—

> সমাজের দারুন নির্যাতনে কঠোর শাসনেই আজ তারা নির্জীব। তাদের জীবন আজ সমাজের নিষ্ঠুর শাসন-দণ্ডকে উপেক্ষা করিতে অক্ষম। নারীরা আজ সমাজের গুপ্ত সামগ্রী। পুরুষের শুধু ভোগেরই বস্তু। বিলাসের পুতুল মাত্র।....পাড়াগাঁয়ের নারী নির্যাতন দেখিলে নারী জীবনের ব্যর্থতার কথা ভাবিয়া হৃদয় ফাটিয়া যায়। নারীরাও যে রক্ত মাংসের শরীর, তাদেরও যে প্রাণ আছে এটা পল্লী পুরুষেরা খুবই কমই ধারণা করিতে পারে। লাঙ্গল স্কন্ধে লইয়া গোরুকে যেমনভাবে হৃদয়হীন কৃষকেরা মারিতে থাকে, পল্লীগ্রামের লোকেরাও আপন স্ত্রীকে খুঁটিনাটি অপরাধে তদ্রুপ নির্যাতন করে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৫][৪২]

মুসলিম সমাজের মোল্লা ও মৌলবীরা নারীদেরকে মাতৃভাষা বাঙ্গলা ও রাজভাষা ইংরেজিতে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে সর্বসময় বিরুদ্ধ মতামত পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে নরুন্নেচ্ছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীর মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> পুরুষানুক্রমে যুগ যুগান্তর ধরে বাঙ্গলা দেশের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, আজন্ম বাঙ্গলার ফলে আর জলে কলেবর বৃদ্ধি করে, আর এই বাঙ্গলা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব প্রকাশ করেও যদি বাঙ্গালী না হয়ে অপর কোনও একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের আর কখনও উত্থান নাই। অধিকন্তু চির তমসাচ্ছন্ন গহ্বর মধ্যে পতন অবশ্যম্ভাবী। [প্রতিবেশী, পৃ. ২২৫][৪৩]

তবে হিন্দু ধর্মের নারীদের ক্ষেত্রে এত বাধা নিষেধ ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তালময় সময়ে বাংলার হিন্দু নারীরা কোথাও কোথাও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। সেই রকমই একজন নারীর কথা

উল্লেখ করেছেন লেখক গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর 'প্রেম নেই' উপন্যাসটিতে। ফটিকের কলকাতায় আসার পর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়েই লেখক হিন্দু নারীর ইংরেজি শিক্ষার প্রসঙ্গটিকে নিয়ে এসেছেন।

> কলকাতায় দুজন মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ 'মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট' এই বিষয়ে তার মনে প্রথম প্রশ্ন তোলে। এক মহিলা হচ্ছেন তার সহপাঠিনী মিস্ লতিকা পালিত। আরেকজন মহিলা হচ্ছেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। মিস্ পালিতই তাকে একবার একটা ঘরোয়া বৈঠকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ছোটো একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন সরোজিনী, রাজনৈতিক বক্তৃতা। তাঁর ইংরাজী উচ্চারণ এবং অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর তাকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেলেছিল। [পৃ. ১০৭][৪৪]

সুধাকর বাবুকে হাসেম সাহেবের বলা কথার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের দুটি স্পষ্টরূপ ফুটে ওঠে—

> আপনাদের কবি বলেন, না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না। আর আমাদের মোল্লা সাহেবরা বলেন, মুসলমানের ললনা, খবরদার, তোমরা জাগিও না। তোমরা জাগিলেই ইসলামের সর্বনাশ ঘটিবে। [প্রতিবেশী, পৃ. ১২১][৪৫]

শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীরা তাদের এতদিনকার সমস্ত বাধা বন্ধনকে ছিন্ন করে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছিল। ১৯২৯ সালে মিস্ ফজিলতুন নেসা এম এ যে কথাগুলি বলেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য—

> নারী এতকাল নিজেকে মোহ আবরণে ঢেকে রেখে এই বিচিত্র পৃথিবীর সৌন্দর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে—কিন্তু আজ অনুতপ্ত নারী প্রাণ সেই কুৎসিত বিলাসের ফাঁসি ছিন্ন করে বাহিরের জগতের সাথে পরিচয় স্থাপন করতে চাচ্ছে। সমস্ত নারীমন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু জগতের সাথে পরিচয় স্থাপন করতে চাচ্ছে। সমস্ত নারী মন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংগ্রাম করবার যে প্রধান অস্ত্র শিক্ষা ও জ্ঞান ; তাই তাদের নাই—আছে কেবল দারুণ একটা আত্মগ্লানি, মর্মভেদী একটা অনুশোচনা, আর সর্বোপরি মুক্তির জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। এর জন্য সর্ব প্রথম আবশ্যক শিক্ষা। শিক্ষা বলতে কেবল কয়েকটি ডিগ্রির ছাপ নয়—যে শিক্ষা মনকে উন্নত ও প্রশস্ত করে বিবেক বুদ্ধিকে সুমার্জিত ও সুচালিত করে সেই শিক্ষা, যে শিক্ষা ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান বজায় রাখার উপযোগী শক্তি দেয়, সেই শিক্ষা.....মুসলিম মেয়েদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে না পারলে এ সমাজের উন্নতি কোনও কালেই হবে না। তাই কেবলমাত্র পুরুষের উপর সব কর্তৃত্বের ভার দিয়ে বসে থাকলে আর মেয়েদের চলবে না। এবার নিজেদের হাতেই শিক্ষার ভার নিতে হবে। নারীও যে মানুষ, সভ্য সমাজে তার পরিচয় দিতে হবে। ভিক্ষুকের মতো কেঁদে, পায়ে ধরে চেয়ে, প্রত্যাখ্যান অপমানের পশরা না বয়ে নিজের ন্যায্য অধিকার জোর করে আদায় করে নারীত্বের বন্ধন মুক্ত করতে হবে। শিক্ষানেই তাই সাহসও নেই—কিন্তু সে শিক্ষা অর্জন করতে হবে।....যে কারা শৃঙ্খল মুসলমান নারীর পায়ে পরিয়ে তাকে আজ সমস্ত জগতের নারীর সামনে দীনা হীনা করে রাখা হয়েছে, সে শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে হবে, চূর্ণ বিচূর্ণ করতে হবে। হয়ত তার পা কেটে ক্ষত বিক্ষত হবে তবু অপমানের হাত থেকে লজ্জার হাত থেকে নারী মুক্ত হবে। এই তার জয় পর্ব। কারা শৃঙ্খল যে কেবল মুসলিম নারীকেই তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে তা নয়, সমস্ত মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। [প্রতিবেশী, পৃ. ২৫৯-২৬০][৪৬]

তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীরা যে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব যে এগিয়ে ছিল তা বলা যাবে না। হিন্দু সমাজের নারীদের জীবনে নানা সময়ে নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতা এসেছে। সেই সমস্ত বাধা-প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে অনেক নারীই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন সাধারণ হিন্দু বাঙালি ঘরের কন্যা, জায়া, জননী বা পুত্রবধূ। ভারত তথা বাংলাতেই প্রথম নারী শিক্ষার আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। নারীদের শিক্ষা বিষয়ক ধারণাটি ইংরেজদের হাত ধরে এলেও তার পূর্ণতা লাভ করেছিল তৎকালীন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি নব্যযুবকদের হাত ধরে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই বাংলায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনে কতিপয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এগিয়ে এসেছিলেন। তাই আন্দোলনটি প্রথম অবস্থায় ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারেনি। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও যুব সম্প্রদায় স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়টি নিয়ে বেশি করে উৎসাহী বোধ করতে লাগলেন এবং তাঁরা সমাজের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে নানা আলোচনা উপস্থিত করতে লাগলে ব্রাহ্মসমাজের নেতারা মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ''কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ''[৮ম পাঠ পৃ. ১১৫][৪৭]। শ্লোকটিকে স্ত্রী শিক্ষার মহামন্ত্র করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর সেই বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশু বালিকাদের উদ্দেশ্যে সমাজের একদল মানুষ নানারকম কুৎসিত ও অভদ্র কথা বলতে লাগলেন। এই বিষয়টিকে শিবনাথ শাস্ত্রী ''রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'' গ্রন্থের 'বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন'নামক পরিচ্ছদে খুব সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন সেই সময় সমাজের এক দল লোক বলতে লাগলেন—''এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল' মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাক্‌বে না। [৮ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১২৫][৪৮]

সেই সঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্ন বাবুদের মজলিসে রসিকতা করে বলেছিলেন—

> বাপ্‌রে বাপ্, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক 'আন' শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে। [৮ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১২৫][৪৯]

সমকালীন পরিস্থিতিতে বাংলার নারী শিক্ষার জোয়ার দেখে কবি ঈশ্বরগুপ্ত বলেছিলেন—

> যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
> এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে,
> আর কিছু দিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
> আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
>
> [সমগ্রন্থ, ৮ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১২৫][৫০]

কবি ঈশ্বরগুপ্তের ভবিষ্যদ্বাণী ধীরে ধীরে সফল হতে আরম্ভ করল। ১৮৪৬ সালে বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি যে ধীর গতিতে শুরু হয়েছিল, পরবর্তী ক্ষেত্রে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের হাতে যা কিছুটা গতি পেয়েছিল, তার পূর্ণরূপ ধারণ করেছিল, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের হাত ধরে। আমরা এর ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পাই যে, উনিশ শতকেই রাসসুন্দরী দেবীর লেখা আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থটি নারীদের প্রথম গ্রন্থ হিসেবে ছাপা হয়ে বেরোয়। তাঁর গ্রন্থটির নাম ছিল 'আমার জীবন'। কিন্তু রক্ষণশীল শিক্ষিত পুরুষ সম্প্রদায় ছিলেন নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। তাই ১৮৮০ সালের চৈত্র সংখ্যায় রক্ষণশীল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নারী শিক্ষা সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—

> আমাদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী—অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় পুরুষদিগের ন্যায় তাহারা ধর্মে বিশ্বাসশূন্য ও সুনীতি বিচ্যুত হইবেন। স্ত্রীজাতির মাতারূপে পুত্র কন্যার ওপর প্রভূত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। বাল্যকালে মাতার নিকট আমরা যে সকল ভাব প্রাপ্ত হই এবং যে সকল বিশ্বাস শিক্ষা গ্রহণ করি তাহার এতদূর বল যে জীবনের শেষাবস্থা পর্যন্ত তাহা আমাদিগের হৃদয়ে আধিপত্য করে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, ধর্মে বিশ্বাসশূন্য, সুনীতি বিচ্যুত বঙ্গীয় নারীর পুত্র কন্যাগণ যে অত্যন্ত অবনত চরিত্র হইবে তাহা আমরা অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীলোকগণের পক্ষে কোনোক্রমেই উন্নতিকর ও শুভফলপ্রদ নহে।''[৫১]

কিন্তু সমাজের এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সমাজের চারিদিকে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল মেয়েরা ক্রমশ আত্মসচেতন হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার অচলায়তন মেয়েদের কাছে ভাঙতে শুরু করল। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পাই, ১৮৮৩ সালে বেথুন মহাবিদ্যালয় থেকে কুমারী কাদম্বিনী বসু ও কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুমারী চন্দ্রমুখী বসু প্রথম বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও সমান অধিকার আছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই সময়ের নারীদের জ্ঞানোন্মেষের অঙ্কুর বিয়ের আবির্ভাবে নষ্ট হয়ে যেত। শুধুমাত্র সমাজ তাকে নির্দেশ দিত তার শারীরিক শুচিতা রক্ষা করার। সমাজের চাপিয়ে দেওয়া শুচিতা বজায় রাখতে গিয়ে নারীকে তার মনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। শেষপর্যন্ত নারীরাই সমাজের সমস্ত রকম বঞ্চনার স্বীকার। সমাজের বিধানদাতারা নারীদেরকে ভয় দেখিয়ে এবং তাদের মনকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তারা যদি শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত হয় তাহলে তাঁদের জীবনে বৈধব্য নেমে আসবে। এতকিছু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নারীরা শিক্ষা রাজনীতি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। তার প্রমাণ আমরা পাই ১৮৮৯ সালে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৫ম অধিবেশনে তিনজন বঙ্গললনার যোগদানের ঘটনার মধ্য দিয়ে। সেই তিনজন নারীরা হলেন, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও বসন্তকুমারী দাস। ধীরে ধীরে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নারীরা স্বদেশি আন্দোলনে এবং সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। যে সমস্ত নারীরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাদেরকে পুরুষ প্রধান সমাজে রক্ষণশীল মনুষেরা চরিত্রহীন ।বা স্বৈরিণী বলে আখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু সেই সময়ের শিক্ষিত নারীরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সংসার সন্তান সামলেও শিক্ষাক্ষেত্র এবং রাজনীতিতে সফল সক্রিয় অংশগ্রহণ করে চূড়ান্ত সফল হওয়া সম্ভব। এইভাবেই নারী 'আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার' অর্জন করতে শুরু করেছিল। নারী ধীরে ধীরে মাতৃত্ব প্রেয়সীত্ব এবং পত্নীত্বের ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে এক সময় যে বিশুদ্ধ নারীত্বে উপনীত হয়। তখন সে কবির ভাষায় বলে উঠতে পারে 'আমি নারী, আমি মহীয়সী।' প্রসঙ্গক্রমে লেখক গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে আমরা দেখি, যে নারী এতদিন ধরে গৃহে বন্দি ছিল, যারা নিজেদের মনের জ্বালা মনেই প্রশমিত করে গেছে। তারা এবার বহির্বিশ্বের কাছে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানান দিতে আরম্ভ করেছে। আর তারই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় ফুলকির [অমিতা] কথার মধ্য দিয়ে—

> হাজার হাজার বছর ধরে তারা চেষ্টা করে আসছে তাদের কথা শোনাবার। তারাও তো শোনাবার কান আর বোঝার মন খুঁজে হন্যে হয়ে গিয়েছে। পায়নি না? তাদের কথা তারা কাউকে কোনওদিন শোনাতে পারেনি। এরা হচ্ছে নারী। নারীকে সম্প্রদায় বলবে কিনা এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে শামিম। কিন্তু এরা যে স্বতন্ত্র একটা জগতের বাসিন্দা সেটা কি করেই বা বোঝাই তোমাদের। জগৎ তো আসলে দুভাগে বিভক্ত। একটা পুরুষের জগৎ আর একটা মেয়েদের জগৎ। এইটেই আসল ভাগ শামিম। নারীর জগৎ বঞ্চিতদের জগৎ। সে নারী হিন্দুই হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টিয়ান হোক কি যেই হোক। নারী মানেই বঞ্চিত। হিন্দু নারী হিন্দু পুরুষ জগতের বঞ্চনার শিকার, মুসলমান নারী মুসলমান পুরুষ জগতের বঞ্চনার শিকার, অস্পৃশ্য নারী অস্পৃশ্য পুরুষ জগতের বঞ্চনার শিকার। সব চাইতে বড় বঞ্চনা নারীদের মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার হরণ। পুরুষের সমস্ত শাস্ত্র নারীর এই অধিকার হরণ করেছে শামিম। মেরুদণ্ড খাড়া করে মানুষ মাত্রেই দাঁড়াতে চায়। নারীরাও মেরুদণ্ডী প্রাণী এ কথা নারীরা জানেই না। এই বঞ্চনার কোনও নজির নেই। নারীরা যে পুরুষের মতোই একটা অস্তিত্ব, সেটা যেমন পুরুষেরা ভুলে গিয়েছে, তেমনি নারীরাও ভুলে গিয়েছে। মাথা তুলে দাঁড়ানো যে মানুষের মৌলিক অধিকার, মেয়েরা মানুষ হলেও, সেটা যেন তাদের সম্পর্কে খাটে না। তোমাদের আচার আচরণ দেখে তাই মনে হয় শামিম।" [পৃ. ১৮৪][৫২]

তাই নারী আজ বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে। নিজেদের আপন ভাগ্য জয় করবার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। শিক্ষা রাজনীতি এমন সমাজের নানা গঠনমূলক কাজে নারীরা এগিয়ে আসতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে যাত্রা শুরু করে বিংশ শতকে তার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। ১৮৯০ সালে সরলাদেবী চৌধুরানী [ঘোষাল] ইংরেজিতে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। বাংলা

তথা ভারতীয় নারীদের উন্নয়নের স্বার্থে ও স্ত্রীশিক্ষা সহ অন্যান্য কর্মসূচীকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তার করার জন্য মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হতে থাকে বিংশ শতকের শুরু থেকেই। ১৯১০ সালে এলাহাবাদে ভারতের প্রথম মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়। যার নাম দেওয়া হয় 'ভারতীয় স্ত্রী মহামণ্ডল'। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মূলত সরলাদেবীই। পরবর্তীকালে লেডি অবলা বোস 'নারী শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে প্রায় ২০০টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন মেয়েদের জন্য। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তিনি নিয়োগ করতেন বিধবাদের। 'নারী শিক্ষাসমিতি' শুধুমাত্র নারীদের শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সেই সঙ্গে শিশু ও মাতার স্বাস্থ্য রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও এই সমিতি করত। সভা সমিতি বা শিক্ষার মধ্যে নারী প্রগতির চিন্তা-চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল না। তৎকালীন সময়ে অসংখ্য নারী, শুধুমাত্র বাংলা নয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। আমাদের ভারতীয় নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহীদ হয়েছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তাছাড়া সেই সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, যুগান্তর, ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি ও পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেও মেয়েরা ধীরে ধীরে যোগদান করতে থাকে। যে রক্ষণশীল সমাজ মেয়ে হওয়ার জন্য লেডি অবলা বসুকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে দেয়নি, সেই রক্ষণশীল সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে নারীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে। ব্রিটিশ ভারতে বিশেষ করে বাংলায় ছাত্র সংঘের পাশাপাশি ছাত্রী সংঘও গড়ে উঠতে দেখা যায়। ব্রিটিশ শাসিত কলকাতায় খোদ বেথুন কলেজেই ছাত্রী সংঘ গড়ে উঠতে দেখা যায়। আর তার নেতৃত্ব দান করেছিলেন কল্পনা দত্ত [যোশী]। তিরিশ চল্লিশের দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় ছোটো ছোটো আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখা যায়। সেই সমস্ত আন্দোলনে নারীদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। তারই ছায়াপাত আমরা লক্ষ করি গৌরকিশোর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো' গল্পাংশের 'করবীদি' ও 'কমরেড নির্মলা সেন' চরিত্র দুটির মধ্য দিয়ে। 'সাগিনা মাহাতো' গল্পাংশের 'করবীদি' রচনাংশটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যে, চরিত্রটির সঙ্গে কোথাও যেন 'কল্পনা দত্ত'র [যোশী] চরিত্রটির মিল লক্ষ করা যায়। 'করবীদি'ও একজন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তিনিও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি বলেন—'স্বাধীন যে হয়েছি, স্বাধীন যে হতে পারি, তার প্রমাণ দেবার এই তো সময় এল।' [পৃ. ২০৪][৫৩] লেখক গল্পটিতে দেখিয়েছেন যে, এই করবীদির আহ্বানে সেই সময়ে স্কুলে দরিদ্র ছাত্রীরাও দেশের কাজের জন্য তাদের একমাত্র অলঙ্কারও খুলে দিয়েছে। তিনিও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নারীদের রাজনৈতিক পার্টিতে যোগদানের ঘটনা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জীবন সর্বস্ব দান করার ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি, লেখক সেই সমস্ত নারীদের পরিবারের আপত্তি ও বাধা থাকা সত্ত্বেও সবকিছুকে উপেক্ষা করে কীভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তার বর্ণনা করতেও লেখক ভোলেননি। করবীদি বলেছিল—'বাবা তার মেয়ের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করতে চাইলেন না। যুক্তি মানলেন না। তাড়িয়ে দিলেন।" [পৃ. ২০৪][৫৪] করবীদির প্রসঙ্গে দিন্দা বলেছিলেন—'করবীকে পলিটিকস ছাড়তে বলেননি ওর বাবা। তবে ঝান্ডা ঘাড়ে করে ওঁর চোখের সামনে এই শহরে ওঁর মেয়ে ঘুরবে এটা উনি সহ্য করবেন না। রাস্তাঘাটে বক্তৃতা দেওয়াও উনি পছন্দ করেন না।' [পৃ. ২০৫][৫৬] এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী কল্পনা দত্তের রাজনৈতিক কিছু ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে। কল্পনা দত্ত যিনি প্রথম বেথুন কলেজে ছাত্রী সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য তিনি ১৯৩১ সালে গ্রেফতার হন এবং ১৯৩৩ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তা সত্ত্বেও তিনি ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩ সালে C.P.I. পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। এই রকমই এক প্রতিবাদী নারী চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে করবীদি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। দিন্দার কথার প্রতিবাদ করে শরৎদা বলেছিলেন—

ঝান্ডা ঘাড়ে করে কোন মেয়ে এই শহরে রাজনৈতিক প্রসেশনে যোগ দিতে পারে, কার কল্পনায় এটা ছিল। করবী দেখিয়েছে তা সম্ভব। এই শহরে নারীদের মুক্তি আন্দোলন যদি কোনও দিন সম্ভব হয়, সেদিনের মেয়েরা প্রেরণা পাবে আজকের এই করবীর কাছ থেকে। আমরা যদি নারী পুরুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, যদি প্রত্যেকের বাক-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তবে পথে-ঘাটে করবীর বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করছি কেন? [সমগ্রন্থ পৃ. ২০৬][৫১]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত করবীদি তার রাজনৈতিক জীবনটিকে সম্পূর্ণ ভাবে ধরে রাখতে পারেননি। নারীর জন্য তৈরি করা সমাজের গণ্ডীতেই তাকে আবদ্ধ হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করে ঘরকন্না করতে হয়েছে। সে নিজে মুখে দিন্দার কাছে বলেছে—'রাজনীতি তো জীবন নয় ভাই, জীবনের একটা অংশ।' [পৃ. ২১৫][৫২] লেখক বোধহয় এখানেই অতিসর্ন্তপণে কল্পনা দত্তের [যোশী] চরিত্র থেকে করবীদি চরিত্রকে সরিয়ে এনেছেন। তবে কল্পনা দত্তও [যোশী] পরবর্তী জীবনে C.P.I. পার্টির সদস্য পি. সি. যোশীকে বিয়ে করেন। তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন রাজনৈতিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে হয় না। কারণ তিনি ১৯৪৬ সালে পার্টির প্রার্থী হিসাবে চট্টগ্রাম বিধানসভাকেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেননি। অন্যদিকে করবীদি বলেছে—'আমি জীবন চেয়েছিলাম। পার্টি নয়।' [পৃ. ২১৫][৫৮] লেখকের স্বাতন্ত্র্য এখানেই। তবে লেখকের সৃষ্ট চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য বিচার করা আলোচ্য অধ্যায়ের বর্ণিতব্য বিষয় নয়। তাই আমরা করবীদি চরিত্রটির পাশাপাশি কমরেড নির্মলা সেনের চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করে দেখব তৎকালীন সময়ে নারী চরিত্রের আলোকে। তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলিতে এমন অনেক মহিলাকর্মী ছিলেন যারা নিজেদের সমগ্র জীবনটাকেই দেশের জন্য দেশের কাজের জন্য এমনকি রাজনৈতিক দলের জন্যও উৎসর্গ করেছেন। 'সাগিনা মাহাতো' গল্পাংশে 'কমরেড নির্মলা সেন' রচনাংশটিতে নির্মলা সেন বলেছেন—

কমরেড, যশ চাইনে, পদ চাইনে, কিছুই চাইনে। যেদিন পার্টির ইতিহাস লেখা হবে, সেই ইতিহাসের কোনওখানে যদি একটা লাইনও লেখা থাকে—নির্মলা সেন—এই বিশ্বস্ত কর্মী কর্তব্য করে মরেছে—তবেই আমার পাওয়া হয়ে গেল। [পৃ. ২২৭][৫৯]

এইরকমই আরেকটি চরিত্র হল নিরুদি। দেশের জন্য পার্টির কাজে নিজের জীবনটা উৎসর্গ করেছেন। তিনি ধানকল শ্রমিক আন্দোলন, চা বাগান শ্রমিক আন্দোলন এমনকি রেল শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছিলেন। নির্মলা সেন, নিরুদির মতো এমন অনেক নারী আছেন যারা ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস মেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। 'সাগিনা মাহাতো' গল্পাংশের একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে এই রকমই একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

একটা পাহাড়ি মেয়ে ঝাঁটা দিয়ে একটি লোককে দমাদম পিটছে। সেও মেয়েটাকে কিল ঘুষি লাথি চালাচ্ছে। [পৃ. ২৩৪][৬০]

এখন মেয়েরা শুধু পড়ে পড়ে পুরুষের হাতে মার খাবে না। তার বিরুদ্ধে তারা প্রবল প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াবে। কারণ দেশ মাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের সঙ্গে সঙ্গে তার কন্যা সন্তানদেরও অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। এটাই হচ্ছে সেই সময়ের প্রগতিশীল নারী ও শিক্ষিত তরুণ যুব সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারত ভেঙে দুভাগে বিভক্ত হল। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলা, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ-অসম-বিহার-পাঞ্জাব- হরিয়ানাসহ খণ্ডিত ভারতবর্ষ। দেশ খণ্ডিত হওয়ার ফলে নিশ্চিত বাসস্থানের আশায় এপার বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানে আবার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে পশ্চিমবাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ ক্রমশ আসতে থাকে। পশ্চিমবাংলায় দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশভাগের ফলে অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নারীদেরকে আরো একবার 'পরিযায়ী' হতে হল। বিষয়টিকে অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। তাঁর 'পরিযায়ী নারী' গ্রন্থটিতে। তিনিই নারীকে 'পরিযায়ী' অভিধায় অভিহিত করেছেন।

জন্মসূত্রে পরিযায়ী নারী যে শ্বশুরের ভিটেতে নিজস্ব সীমিত অধিকারের ভোগ পায়, রাষ্ট্রশক্তির তাড়নায় সেটুকু স্থিতিশীলতাও বিঘ্নিত হয়ে পড়ে।যে বাস্তুভিটেকে ঘিরে মেয়েদের জীবনের প্রাত্যহিকতা এবং ঠাসবুনুনী, সেটিই আক্রান্ত হয়, সাংসারিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যেটুকু মানবাধিকারের সঞ্চার হয়, নতুন বাস্তুচ্যুতির সম্ভাবনায় সেটুকুও তলানিতে গিয়ে ঠেকে। গোটা পরিবারের সঙ্গে মেয়েদের পরিযান শুরু হয়, সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসক তাদের শাসনের অবসান ঘটায়, ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের অংশগুলির ওপরে ব্যবচ্ছেদের কোপ ফেলে। ধর্মের ভিত্তিতে পূর্বদিকে বাংলা ও পশ্চিমে পাঞ্জাব-সিন্ধুকে নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি হল। তার ফলে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ গৃহচ্যুত হল। বিয়ে হয়ে যেসব মেয়েরা একবার পিতৃগৃহ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, তারা আবার নতুন করে বাধ্য হল ঘর ছাড়তে। এক্ষেত্রে তফাৎ মস্ত বড়ো। দেশভাগ যাদের উদ্বাস্তু করল, তাদের জন্য কোনও জায়গা নির্দিষ্ট হল না। নিরাপত্তার অভাবে বহু প্রজন্মের লালিত বাড়ি ছেড়ে বেরোতে হল অনিশ্চয়তার উদ্দেশ্যে, নিজেদের বাড়ি কর্মজগৎ সংসারের মধ্যে যেটুকু মানবাধিকার গ্রথিত ছিল, সবই একঘায়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। ঔপনিবেশিক শাসন যে নাগরিকত্ব থেকে ভারতবাসীকে বঞ্চিত করে রেখেছিল, বাংলা এবং পাঞ্জাব-সিন্ধের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, স্বাধীনতার পরও নাগরিকত্বের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।" [পৃ.২১-২২][৬১]

একটি দেশের স্বাধীনতা, সেই দেশের নারীর সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেনি, সেই কারণে লেখক গৌরকিশোর ঘোষ এই বিষয়টিকে 'মহাভারতের স্ত্রী পর্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মহাভারত লেখা হয়েছে তার বহু বছর কেটে গেছে। মহাভারতের স্ত্রী পর্বে দেখা গেছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে ব্যাধের শরে শ্রীকৃষ্ণ নিহত হওয়ার ফলে যদুবংশের ষাট হাজার অসহায় অনাথা নারীর যা অবস্থা হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী হু হু করে পেরিয়ে গেলেও ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান দুটি দেশ বিভক্ত হলে সেই দেশের নারীদের অবস্থাও তাদেরই মতো হয়েছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অবিভক্ত বঙ্গদেশে অসংখ্য নারী ধর্ষিত হয়েছে। কিন্তু বিভাগ পরবর্তী দুই বাংলায় এমন কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে রাতের অন্ধকারে নারীরা হয়ে ওঠে দুর্বৃত্ত পুরুষের শিকার। যেসব দেখা গিয়েছিল মহাভারতের স্ত্রী পর্বে, হিংস্র বাজপাখির মতো দস্যুরা ছোঁ মেরে পড়েছিল ষাট হাজার নারীর পালে। শুরু হয় লুণ্ঠন, ধর্ষণ, রমণীদের আর্তস্বরে সেই প্রান্তর, বনভূমি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বহু নারী স্বেচ্ছায় সোল্লাসে দস্যুদের অনুগামিনী হয়। বাকিদেরকে তারা ধরে বেঁধে বলপূর্বক অপহরণ করে, অসহায়, অথর্ব পুরুষত্বহীন অর্জুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখতে থাকে। তাঁর গাণ্ডীব তখন পর্বতের মতো গুরুভার হয়ে ওঠে। যা তিনি তুলতেই পারেননি। বলবীর্যহীন অর্জুন অক্ষম চোখে শুধুমাত্র চেয়ে দেখেছেন তাঁর চোখের উপর দিয়ে যদু রমণীদের দস্যুরা লুণ্ঠন করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আবার অর্জুন রক্ষা করতে পারবেন না জেনে কিছু রমণী স্বেচ্ছায় তাঁর সামনে দস্যুদের অঙ্কশায়িনী হয়েছিল—এই ঘটনাটি ছিল আরো বেশি মর্মান্তিক। [মনের বাঘ][৬২] ঠিক একই রকম অবস্থা দেখা যায় বিভাগোত্তর পর্বে দুই দেশের নারীদের। দুই দেশের পুরুষেরা অর্জুনের মতো বলবীর্যহীন অক্ষম চোখে নারীদের উপর হওয়া অত্যাচারকে চেয়ে চেয়ে দেখে গেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যুগ যুগ ধরে নারীরা অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত। সেই লাঞ্ছনারই একটি চিত্র লেখক তাঁর 'জবানবন্দী' গল্পের মেনকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পাঠকের সামনে। মেনকা নিজের অতীত জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে—

আমার নাম মেনকা। বাবার নাম ফটিক চক্রবর্তী। পাকিস্তানে বাড়ি। কুষ্ঠিয়ার কাছে, সেনহাটি।....বছর পাঁচ ছয় আগেও আমার সব ছিল। বড়ি, ঘর, আশা, ভবিষ্যৎ সব। কিন্তু যে রাত্রে আমাদের বাড়ি লুঠ হল, বাবা খুন হলেন, ভাইয়েরা পালাল, আমার কুমারী দেহটা বার কয়েক ধর্ষিত হল দুর্বৃত্তের হাতে, সেদিন থেকে তিলে তিলে আমার সব গেছে।

পালিয়ে এলাম ভারতে। নিরাপদ আশ্রয়ের আশা তখনও ছিল। শুনেছিলাম সীমান্ত পার হলেই নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওদিকে আশ্রয় আছে। মানসম্ভ্রমের মূল্য আছে। সীতার দেশে, সাবিত্রীর দেশে সতী ধর্ম অটুট রাখার কাণ্ডারী আছে। তাই জীবন তুচ্ছ করে ছুটে এলাম পশ্চিমবঙ্গে। স্থান পেলাম উদ্বাস্তু-শিবিরে। কিন্তু সেখানেও আমার রূপ আর যৌবন নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনি। নিরুপায় হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হয়েছি। দেহ দিতে বাধ্য হয়েছি নানাজনকে। [পৃ. ১৪৯-১৫০][৬৩]

এই রকম পরিস্থিতিতে মেনকা নানা আশ্রয় শিবিরে ঘুরে পাটনায় উপস্থিত হয়, একটি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। শেষ পর্যন্ত সে ভবেশবাবুর আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হয়। মেনকার সেইদিনের অবস্থার বর্ণনা করেছেন লেখক—

মেনকা বড় নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। পরনে ছিল শতছিন্ন একটা কাপড়। পিছনে অতীত তার শূন্য। অধিকাংশ উদ্বাস্তু মেয়ের মতোই। এমনকী চরম লাঞ্ছনার স্মৃতিগুলোও সেই শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানও তার কাছে এক আকারবিহীন অস্তিত্ব মাত্র। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।" [জবানবন্দী, পৃ. ১৪১][৬৪]

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবাংলায় মেনকার মতো অসংখ্য নারী নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় এক উদ্বাস্তু শিবির থেকে আরেক উদ্বাস্তু শিবিরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু তার ফল হয়েছে মর্মান্তিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তারা পুরুষের লালসার শিকার হয়েছে। ফলে অনেকে আত্মহত্যাও পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছে। স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই যখন গ্রাম-শহর চারিদিকে মানুষের তীব্র খিধের দূষিত গন্ধে ভরে উঠল। সেই সময় দু-মুঠো খাদ্যের সন্ধান করতে অনেক নারী পরপুরুষের কাছে তার দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। 'ম্যানেজার' গল্পে যেমন, বিপিন স্যাকরার বউ বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যা হয়ে যায়। এই বেশ্যাবৃত্তিটা সেইসময় সমাজের বুকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নারী তার নিজের দেহ বিক্রি করে পরিবারের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাতে সক্ষম হয়েছে। এইভাবেই যুগ যুগ ধরে নারীরা যেকোনো রকম প্রতিকূল অবস্থাতেও তার পরিবারকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বারবার দেখা গেছে সমাজ পরিবারের কাছে নারীকেই দিতে হয়েছে অগ্নিপরীক্ষা। তবে যুদ্ধ বা কোনো দেশভাগের ফলে নারীর শুধুমাত্র সম্মান বা সম্ভ্রমই হারায় তাই নয়, সেই সঙ্গে যুদ্ধের যূপকাষ্ঠে স্বামী-সন্তানদেরও বলি দিতে হয়। যুদ্ধ বা দেশভাগের আঘাতটা স্বভাবতই মেয়েদের বুকে বেশি করে ধ্বনিত হয়। তাই পৃথিবীর যে কোনো দেশের, যে কোনো সময়ের যুদ্ধের শেষে প্রিয়জনদের হারানোর ধ্বনি নারীকণ্ঠে রোদিত হতে থাকে। ইতিহাসের পাতা উল্টোলে এই ধরনের অসংখ্য চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ইতিহাসে সব থেকে ভয়ঙ্কর অধ্যায় হল—ফ্যাসিস্ট-দস্যুরা অসংখ্য শিশুকে গ্যাস চেম্বারে ফেলে নৃশংসভাবে মেরেছিল। পোল্যান্ডের ওয়ারস-তে একটি ক্যাম্পে পরবর্তীকালে সেই সমস্ত ছোটো ছোটো শিশুদের পায়ের জুতোর পাহাড় লক্ষ করা যায়। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে সেই সমস্ত মায়েরা চোখের জমাট জল মুছে ফেলে, নিজেরা সন্তানের সেই জুতো বুক চেপে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—আর নয়, যুদ্ধ আর নয়,এমন করে আমরা সন্তানহারা, স্বামীহারা হতে পারব না, কাউকে আর হতেও দেব না।' [সেদিনের কথা/গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশন ও বিশ্ব নারী সংঘ, পৃ. ২১৩][৬৫]

আর এই ইতিহাসকে মাথায় রেখেই আমাদের লেখক গৌরকিশোর ঘোষ 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে 'অমিতা'কে দিয়ে বলিয়েছেন—

মেয়েদের অকারণে এত রক্ত ঝরে বলেই হয়ত, বিন্তি, মেয়েরা রক্তপাতকে এত পরিহার করে চলতে চায়। তাই মেয়েরা হানাহানি কাটাকাটি পছন্দ করে না। দাঙ্গা বাধায় না কখনও। কখনও যুদ্ধ ঘোষণা করে না। বিন্তি। রক্তের অপচয় কাকে বলে মেয়েরা ছাড়া আর কেউ সেটা বুঝতে পারে না। অন্তত মেয়েরা যেমনভাবে বুঝতে পারে তেমনভাবে পুরুষেরা পারে না। [পৃ. ৭৮][৬৬]

শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও এইসময় নানা ঘটনায় ঘটনাবহুল। ১৯৪৫ সালের মে মাসে বার্লিন বিজয়ের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তার থেকেও বেশি করে লেখা আছে এই যুদ্ধে সোভিয়েটের নারী পুরুষের আত্মদান, স্বার্থত্যাগ, বীরত্ব ও চরম দুঃখের কাহিনি। সেভিয়েটের নারী-পুরুষের পাশাপাশি

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষদের সাথে নারীদের আত্মত্যাগের কাহিনিও ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হয়ে রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি সেই সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ সারা দেশ জুড়ে লেগেছিল। দেশের এই রকম কঠিন অবস্থার মেকাবিলাও নারীরা দক্ষতার সাথে করে গেছে। সমস্ত রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকে লড়াই করে এগিয়ে গেছেন তারা। যেমন—১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তর বাংলার প্রাণকেন্দ্রকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। চারিদিকে খেতে না পাওয়া মানুষের আর্তনাদ ও হা হাকার। সেই সময় ইউনিভার্সিটির ছাত্রীরা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মহিলা কর্মীরা এগিয়ে এসেছিলেন সেই সমস্ত দুর্গত মানুষদের সাহায্যের জন্য। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা, নারী ও শিশুদের খাদ্য-বস্ত্র জোগাড় করা। এছাড়া তাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছেন অসংখ্য নারী স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মহিলা কর্মী এগিয়ে এসেছিলেন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের সাহায্যের জন্য। পার্টির প্রতি আকৃষ্ট মেয়েরা বাড়ির বাধায় আর ভয় না পেয়ে এগিয়ে এসেছিলেন দেশের নানা সেবামূলক কাজে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, নিবেদিতা নাগ, বিমলা মাজী, বেলা লাহিড়ী, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, মনোরমা বসু, পঙ্কজ লাহিড়ী [আচার্য], শচী লাহিড়ী [বিশ্বাস], মুক্তি ঘোষ [মিত্র], বাণী দাশগুপ্ত প্রমুখ। এদের অনেককেই রাজনীতি করার জন্য বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি করার জন্য পরিবারের ঘোর আপত্তির জন্য বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। এবং তাদের বহু কষ্ট স্বীকার করে নিজদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছিল। এই সময় সারা বাংলায় বহু মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে কলকাতা, চট্টগ্রাম,বরিশাল, মেদিনীপুর ও হুগলি প্রভৃতি জেলায় তা ছিল ব্যাপক ও বৃহৎ। জেলায় জেলায় কৃষক মেয়েদের মধ্যে এই সময় বহু শাখা গড়ে উঠেছিল। শহরের গরিব মেয়েরা এবং গ্রামের হিন্দু-মুসলমান কৃষক মেয়েরাই ছিল মহিলা সংগঠন বা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিগুলির শক্ত ভিত্তি। দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে গ্রাম ও শহর প্রায় ছারখার হয়ে গিয়েছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত মহিলাকর্মীরা গ্রামেগঞ্জে নানা নানা জায়গায় ত্রাণ পৌঁছে দিতে লাগল। সরকারের সাহায্য নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় রিলিফ কেন্দ্র খুলেছিলেন। শুধুমাত্র স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েই নয় ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরের পর থেকে বাংলার প্রাণকেন্দ্রে বুভুক্ষু মানুষেরা ভিড় করতে থাকে। আর সেই সময় থেকেই গৃহস্থ ঘরের মেয়েরাই পেটের দায়ে রাস্তায় কেনাবেচা হতে লাগল। সারা শহর, গ্রামেগঞ্জের বাতাস ভরে গিয়েছিল ক্ষুধার্ত মানুষের তীব্র খিধের দূষিত গন্ধে। এই সুযোগে শশী আচার্যর সুন্দর গোঁসাই এর মতো পুরুষরা মেয়েদের নিয়ে দালালি করতে লাগল। সেইরকমই একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর 'শিকার' গল্পটিতে—

> বাতাসী আর ফিরল না। দু'দিন ধরে খোঁজাখুজি। তোলপাড় করে তুলল শহর, কিন্তু নেই। বাতাসীর পাত্তা নেই। সুন্দর গোঁসাইয়েরও আর দেখা নেই। ওদের আশেপাশে আতঙ্ক ভয়। নিরুপায় ক্রোধ। আর উপরে নিরাবলম্ব আকাশ। কেউ ভাবে না। কেউ কাঁদে না। [পৃ. ৯০][৬৭]

সমস্ত রকম প্রতিকূলতা ও বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সমাজে নারী সম্প্রদায় এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। যেমন—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সারা ভারতের নারী সমাজ বিপুলতর সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। এছাড়া ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল সেদিনের মেয়েরা। এখান থেকেই তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস দৃঢ় হয় সে, তাঁরা শুধু আর গৃহবধু নয়, সংগ্রামে তাঁরাও সৈনিক। ঘরে বাইরে তাঁদের জন্য পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসন পাতা। ভারতের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এই মহিলারাই ছিলেন পথিকৃৎ এবং ভবিষ্যতের উৎসধারা। এই সমস্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অনেক নারী তাদের ঘর-বার একাকার করে দিয়েছিলেন।

এতকিছু সত্ত্বেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারত তথা বাংলার সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। তৎকালীন সময়ে সমাজে বুর্জোয়াদের সাথে সাথে প্রলেতারিত শ্রেণির চরিত্রও পরিবর্তিত হতে থাকে। এই সময় নারী পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমস্ত রকম কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিম বাংলায় এমনকি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে সেই

সময় ঘরের মেয়ে বউরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়াতে শুরু করে। সেই সঙ্গে সমাজে যৌনতার নগ্নরূপটি প্রকাশ পেয়েছে। তৎকালীন সময়ে কিছু কিছু সম্পর্কের মধ্যে অসামাজিকতা লক্ষ করা যায়। নারীর স্বাধীন চিন্তনের পাশাপাশি যৌন বিকার প্রকাশ পেতে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের থেকে বেশী প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে দেখা যায়। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে নতুন নতুন চিন্তার সূত্রপাত হতে থাকে। সেই সময় কর্মক্ষেত্র ছিল সীমিত। তাই সেখানে শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বেকারের সংখ্যা স্ফীত হতে শুরু করে। তবে এর সূত্রপাত হয়েছিল ইংরেজ আমল থেকেই। ফলে মেয়েদেরও ঘর ছেড়ে পথে নামতে হয়েছিল জীবিকার প্রয়োজনে। তৎকালীন সময়ে নারী ও পুরুষ তাদের সমান অধিকার নিয়েই রাজপথে নেমেছিল। তাদের এই অধিকার কোনও আইন করে পাওয়া নয়, জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয়েছে এই অধিকার। বিভাগ পূর্ববর্তী সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ থেকে অনেকটা পিছিয়ে ছিল। আজ আর তা নেই। বরং বিভাগ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায় পূর্ববঙ্গ থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। মণিকুন্তলা সেন, 'সেদিনের কথা' রচনাংশটিতে বলেছেন—''দেশভাগের পর সেই যে দেখতাম, মেয়েরা অবাধে ট্রেনে বাসে বোঝাই হয়ে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে শুধু নিজের নয় পরিবারের ভার কাঁধে নিচ্ছে আজ এই ভিড়ের মধ্যে তাদেরও যেন খুঁজে পাচ্ছি।" [সেদিনের কথা/প্রসঙ্গ ঃ গণ আন্দোলন, পৃ. ২২৫][৬৮]

সেই ধরনের এক নারীর চিত্রই লেখক গৌরকিশোর ঘোষ 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে অমিতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

> খোকা হবার আগেই তাকে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য চাকরি করতে হত। ইসকুলে পড়াত সে। সমীরেন্দ্র তার কিছুদিন আগেই চাকরি ছেড়েছিল। সমীরেন্দ্র চাইছিল অ্যাকাডেমিক লাইনে ফিরে আসতে।....সমীরেন্দ্র যে কত অ্যাম্বিশাস, কত স্বার্থপর সেটা তো জানতে পারেনি সেদিন।....তাই সে তার প্রথম জীবনের দিনগুলো উৎসর্গ করেছিল সমীরেন্দ্রকে। সে যাতে সফল হয়ে উঠতে পারে, অমিতার সেটাই ছিল ধ্যানজ্ঞান। [পৃ. ৬০][৬৯]

সংসার-স্বামী সন্তানের জন্য একজন নারী তার জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু সংসারে পান থেকে চুন খসলে তার সমস্ত দায় গিয়ে পড়ে সেই নারীর উপর। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব-কতর্ব্য কর্ম সমস্ত কিছুই নারীর উপর বর্তায়। সংসারের কাজ পুরুষের নয়, যা সমাজের অলিখিত নিয়ম। 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে 'অমিতার' কথার মধ্যে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

> সমীরেন্দ্র ডক্টরেট করছে তখন। বাড়ি এলেই সমীরেন্দ্রর নালিশ।এটা করে রেখে যাওনি, সেটা খুঁজে পাইনি। নালিশের ফিরিস্তির আর অন্ত ছিল না। যেন সংসারটা কেবল অমিতারই। অমিতা ধরে নিয়েছিল এটাই নিয়ম পুরুষদের কোনও কিছু করতে নেই। [পৃ. ৬০][৭০]

সারাজীবন ধরে একজন নারী সংসারে ও আপনজনের জন্য প্রাণ-পাত করলেও শেষপর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোনোরকম সহানুভূতি সে পায় না। তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে শুধুমাত্র ঘৃণা-অবহেলা আর প্রতারণা। আর তার বিবরণ আমরা পাই মন্টুর মার জীবনের ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

> আমাদের ঘরে মারপিট হয়। মন্টুর বাপ এক এক দিন মদ গিলে আসত। কি পেটান পেটাত আমাকে। কতদিন আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছি। আমার হাড়পাঁজরা গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে মন্টুর বাপ।....সে একটা দৈত্যি ছিল গো। আমার রোজগারে টান ছিল। তার উপর আবার ছিল সুন্দ বাতিক। লিজে যা খুশি করবে, তাতে দোষ হবে নি, কিন্তু আমার বেলায় যত দোষ।" [সম্গ্রন্থ পৃ. ৬৩][৭১]

এতদিন পর্যন্ত নারীকে পুরুষের প্রয়োজনে গৃহে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। আবার সেই নারীকে পুরুষ তার নিজের প্রয়োজনে গৃহের বাইরে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য করে। তারপরেও নারীর ভাগ্যে থাকে লাঞ্ছনা। কিছু না করেও ইনটেলেকচুয়াল পুরুষেরা তাদের আধিপত্য দেখানোর চেষ্টা করে। জমিদারি হারিয়েও জমিদারি সুলভ আচরণ তাদের চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। লেখক গৌরকিশোর ঘোষ সমীরেন্দ্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই চিত্রই ফুটিয়ে তুলছেন।

তোমার খোকা রাজপুত্তুর মা, রাজপুত্তুর।

রাজপুত্তুর? হ্যাঁ, খোকার বাবা রাজার বংশেরই তো ছেলে। সমীরেন্দ্র তখন অমিতার সেই অল্প রোজগারের টাকায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলত, জান মিতা, আমাদের চৌধুরিদের বংশ বারো ভুইয়ার এক ভুইয়ার থেকে নেমে এসেছে। সিলেটের ওদিকে আমাদের বিরাট বিরাট সব তালুক ছিল। বাবা অবধি কি সব সনদ বাক্সবন্দী করে বয়ে বেড়িয়েছেন। দেশ ভাগ হতেই তালপুকুরটুকুও আর নেই। আমার থেকেই নীল রক্ত লাল হয়ে গিয়েছে। আমি এখন ডিক্লাসড্। [প্রতিবেশী, পৃ. ৬২][৭২]

সমীরেন্দ্রের মতো ইন্‌টেলেকচুয়াল পুরুষেরা স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে সিগারেটে সুখ টান দিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মন্তব্য করতেই ব্যস্ত থাকেন। ঘরের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তারা কোনো সময়ই ওয়াকিবহাল নন। তাদের কাছে অ্যাম্বিশানটাই বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষের জীবনে অগ্রগতি এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়াটাই তাদের প্রধান ধ্যানজ্ঞান। সেখানে পরিবার স্ত্রী সন্তান সমস্ত কিছুই গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেনের মন্তব্যটি সবচেয়ে বেশি প্রণিধানযোগ্য।

আমদের দেশে যেটুকু অধিকার মেয়েরা লাভ করেছেন তার প্রয়োগক্ষেত্রে যে সমস্যা ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে তার একটা কারণ হল আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা, সন্তানপালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দানে সরকারের অক্ষমতা এবং সবচেয়ে বড় কারণ এদেশের পিতৃতান্ত্রিক প্রথার কল্যাণে পুরুষের মজ্জাগত জমিদার সুলভ অভ্যাস। যে সমাজ পুরুষের হাতে নারীর লাঞ্ছনার ঘটনায় নিত্য কলঙ্কিত হয়ে থাকে, সে সমাজে শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন হওয়া কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। আমাদের সমাজে স্বামী সেবা পায় আর স্ত্রী সেবা করে এটাই নিয়ম। উভয়ই উভয়ের সেবা বা সহযোগিতা করবে—এটা নিয়ম নয়। জমিদারি না থাকলেও অন্তত 'স্ত্রী' নামক একটি বাধ্য প্রজা এদেশের গরিব স্বামীও পেয়ে থাকে। নতুন যুগের দৌলতে সেই প্রজাটি যদি শিক্ষা পায় অফিসে যায় ও টাকা রোজগার করে, তাতে স্বামীর তেমন মাথাব্যথা নেই যতক্ষণ তার অভ্যস্ত পাওনায় নড়চড় না হয়। তৃষ্ণার্ত স্বামীকে স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে এক গ্লাস জল দেবে এটা নিয়ম, কিন্তু এর উল্টোটা বেনিয়ম। সংঘাতের মূল কারণ এইখানেই। [সেদিনের কথা শেষকথা পৃ. ২৮০][৭৩]

কিন্তু সমাজ নারীকে সবসময় মাতৃরূপে দেখতেই অভ্যস্ত। আর সেই নারীর কাছ থেকেই যখন তার সন্তানকে আইনের সাহায্য নিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেই মায়ের অবস্থার কথা অনুভব করে না পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। সন্তানের সুখের জন্য একজন মা তার সর্বস্ব সুখত্যাগ করে হাসি মুখে। মাতৃহৃদয়ের সেই অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে ভুলে যায় আমাদের সমাজ। আর সেই ঘটনাই ঘটেছে অমিতার জীবনে। অমিতার মাতৃহৃদয়ের অনুভূতিকে বর্ণনা করেছেন লেখক গৌরকিশোর ঘোষ।

''মাতৃস্নেহ! কথাটা যেন প্রথম শুনল অমিতা। 'কি কপাল গো মা তোমার? ছেলে আছে।'' হ্যাঁ আছে। আমেরিকায়। ওহাইওতে। তার বাবার সঙ্গে ছোটো বয়সেই চলে গিয়েছিল। সমীরেন্দ্র, তার প্রথম স্বামী, খোকাকে তার কাছ থেকে ভুলিয়ে, নিয়ে চলে গিয়েছিল। না ভুলিয়ে নয়, কোর্টে দরখাস্ত করে তার প্রথম স্বামী—তার প্রথম সন্তানকে নিজের কাস্টডিতে নিয়ে গিয়েছিল। বিচারক সমীরেন্দ্রের আবেদনই মঞ্জুর করেছিলেন। মায়ের কাস্টডি ছেলের মেন্টাল হেলথের পক্ষে সহায়ক নয়। ভুলিয়ে নয়। সমীরেন্দ্র খোকাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। বাপের কাছেই সে মানুষ হয়েছে তো। মাকে তার দরকার হয়নি। [প্রতিবেশী পৃ. ৫৫][৭৪]

হিন্দু শাস্ত্রে মনু নারীদেরকে যে গণ্ডীর মধ্যে বাধতে চেয়েছিলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারী সেখানেও বঞ্চিত। তাই অমিতাকে বলতে শোনা যায়—

আমি তবে কার অধীন? আমি সরকারী পেনসনের অধীন। আমার স্বত্বাধিকারী কি তবে সরকার? মনুর মতে তো আমার পুত্রের অধীন থাকবার কথা। কোথায় সেই পুত্র? সুনন্দন? খোকা? [প্রতিবেশী পৃ. ৫৯][৭৫]

তাই ধর্মের কোনো বিধানই সমাজে নারীর মর্যাদার গণ্ডিকে ঠিক করে দিতে পারেনি। নারীর অনুভূতির মূল্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে কোনো দিনও ছিল না। সমাজে নারীর মনুষ্যত্বকে নয়, শরীরকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশি করে। নারী দেহলোলুপ পুরুষেরা তাদের জাল বিস্তার করে চলেছে অহরহ। 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে তান্ত্রিকের ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাজের বীভৎস রূপটিকে বর্ণনা করেছেন লেখক। ধর্মকে সামনে রেখে তার পেছনের নোংরা চেহারাটাকে পাঠককে দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখক। ধর্মের মোড়কে সমাজের নোংরা কদর্য চেহারা শুধু বর্তমানেই প্রকট আকার ধারণ করেছে তাই নয়, অতীতেও আমরা একই রকমভাবে সমাজের এই বীভৎস রূপকে দেখেছি এবং অতীতেও তারই পরিবর্তিত রূপকে দেখতে পাবে। আমাদের লেখক গৌরকিশোর ঘোষ তান্ত্রিক চরিত্রের বিবরণ দিয়েছেন মন্টুর মার মধ্য দিয়ে। মন্টুর বাবা কোথা থেকে এক তান্ত্রিককে নিয়ে এসেছিল। তাদের ঘরে যজ্ঞ করবে বলে। ছবিকে দেখে তার মনে হয়েছিল সাক্ষাৎ ভগবতী। তাই তাকে বসিয়েই সারারাত ধরে যজ্ঞ হবে

> ''কোথাও যাবিনে। খবরদার। যজ্ঞির ঠাঁইতে তোকে সারারাত শুয়ে থাকতে হবে। আঁচল পেতে এক কাপড়ে। তোর উপর আজ ভগবান ভর করবে। তন্ত্রিক আমার ছবিকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে গেল।...কেবলই কাতরাচ্ছিল ছবি সাপে ব্যাঙ ধরে গিলে ফেলতে থাকলে যে ধরনের যন্তন্না ব্যাঙের মুখ দিয়ে বার হতে থাকে সেই আওয়াজ গো মা। আমার ভয় হয়েছিল, তান্ত্রিক বুঝি আমার ছবিকে গিলতে নেগেছে।...পরদিন সকালে তান্ত্রিক ঘোষণা করলে, পাঁচ দিন পরে এসে সে ছবিকে নিয়ে যাবে। ছবি এখন ভগমানের ভোগ।....তান্ত্রিক বেইরে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলাম মা। ছবির কাপড় রক্তে ভাসছে। ছবি আমাকে দেখেই মা বলে আমার শরীলে এলিয়ে পড়ল। সেই তান্ত্রিক আর আসেনি মা। [পৃ. ৭৩-৭৪][৭৬]

এই রকম বীভৎস পরিস্থিতিতে ছবির মার পক্ষে ছবিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তান্ত্রিকের মতো ডাকাতের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না। কিন্তু মাতৃ হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে নারীর অসহায়ত্বে বেদনাই বার বার করে বেরিয়ে এসেছে। সে কোনো প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়নি। শুধুমাত্র অমিতা ও ছবির মার মাতৃ হৃদয়ই আঘাত প্রাপ্ত হয়নি। সমাজে বিভিন্ন সময় পুরুষ দ্বারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে মাতৃহৃদয় বারে বারে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। তার বেদনা সহ্য করতে হয়েছে নারীদেরকে বিশেষ করে সন্তান হারানোর বেদনা বা সন্তান জন্ম দিতে না পারার বেদনা। অন্যদিকে একজন পিতা তার সন্তান হারানোর বেদনাকে ভোলার চেষ্টা করেন নেশা ও অন্য নারী সঙ্গ ও নিজের কর্ম জগতের মধ্যে দিয়ে। 'প্রেম নেই' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক গৌরকিশোর ঘোষ এই রকম দুটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।—

সন্তান হারানো 'ছোট কর্তার' পুত্রশোক বোঝাতে লেখক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—'নেশার কাছে পুত্রশোকও জব্দ।' ছোট কর্তা বলেছেন—'সময়মতো ওষুধ পেটে পড়লে, এসব যন্ত্রণা কিছুই ভোগ করতে হত না।' অন্যদিকে সন্তান হারানোর শোকে 'ছোট বউয়ের' জীবন্ত অস্তিত্বটি যেন শিলাপাথরে পরিণত হয়েছিল। এবং স্মৃতিশক্তি হারিয়ে পাগল হয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় ছোটকর্তা অবলীলাক্রমে চালায় নানা ধরনের অত্যাচার। অন্যদিকে নিজে গোপালদাসীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অবৈধ মূলক সম্পর্কে জড়াতে থাকে।

> ''গোপালদাসী পাটরানির রূপ ধরে ছোটকর্তার মনের সিংহাসনে বিরাজ করতে থাকে। মায়া মমতায় প্রেমে ছোটকর্তা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়তেন, যেন পঙ্গুই হয়ে পড়তেন। অসাড় শিকারকে নিয়ে শিকারি বিড়াল যেমন খেলা করে, গোপালদাসী তেমনি ছোটকর্তার শিথিল ব্যক্তিত্ব নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলা করত। পিরিতের মানুষের হাতে নিজেকে স্বেচ্ছায় এমন বিলিয়ে দিয়ে যে কী অপূর্ব সুখ, গোপালদাসীর মতো ভাবের মানুষের সংস্পর্শে যে কখনও আসেনি, সে কী করে বুঝবে? এ সুখের কাছে ঘর সংসার, প্রতাপ প্রতিপত্তির সুখ বিলিতি মদের পাশে যেন বেলের পানা বলেই ছোটকর্তার মনে হত। [জল পড়ে পাতা নড়ে, পৃ. ৮৫][৭৭]

এই সমস্ত ঘটনার ফলে 'ছোটকর্তার যে মনটি স্ত্রীর প্রেমে, তাঁর ভালোবাসায় উষ্ণ হয়ে থাকত, এই ঘটনার পর সেটি যেন মৃত উনুনের মতো শীতল হয়ে গেল।' [সম্গ্রন্থ, পৃ. ৯১][৭৮] অর্থাৎ 'শূন্যতা কাছের মানুষকেও কত দূরে

সরিয়ে দিতে পারে।' [প্রেম নেই, পৃ. ৩৪২][৭৯] 'প্রেম নেই' উপন্যাসে 'ছবি'র শিশুটি ভূমিষ্ঠ হতে গিয়ে মারা গেছে। এই খবর যখন সে শুনতে পায় তখন তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বলে ওঠে—'আমি কী নিয়ে থাকব? আমারে কন। কষ্ট কষ্ট কষ্ট। আমার বড় কষ্ট।' [পৃ. ৩৪১][৮০] মাতৃ হৃদয়ের শূন্যতা একজন পুরুষের পক্ষে বোঝা হয়তো সম্ভব নয়। নারী তার মনের বেদনাকে মনের মধ্যে রেখে এগিয়ে চলতে চায় সামনের দিকে। নারী—সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত বাঁধাকে অবলীলায় অতিক্রম করতে পেরেছে। কিন্তু সমাজ নারীকে পরিবারের অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধতেই বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে ফ্রয়েডের একটি মন্তব্য সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য—নারী হল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। জন্ম মুহূর্ত থেকে সমাজ একজন নারীকে শিখিয়ে দেয়—'নারী নরকের দ্বার।' পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান পুরুষের নীচে। তাকে সন্তুষ্ট করাই নারীর জীবনের প্রকৃত ধর্ম। সমাজে পুরুষের মনের দহনজ্বালা জুরাবার জায়গা আগে থেকেই তৈরি থাকত। যেমন—'ছোট কর্তা' চরিত্রটিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, গোপালদাসীর দেহের উত্তাপে তার নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হত।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কখনোই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেখানে সমাজ বিনা অর্থ ব্যয়ে সামান্য কিছু খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময়ে নিজেদের ঘর ও সন্তান-সন্ততি দেখাশুনার লোক তারা পেয়েছিল। সামাজিক অনুশাসনই নারীকে গৃহাভিমুখী করেছে শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীর অধিকার পাওয়ার দাবি এসেছিল অনেক পড়ে। জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম নারীদের অবস্থা ছিল অনেক বেশি জটিল। মুসলিম নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আনোয়ার হোসেন বলেছেন—

> মুসলিম লিগ তাদের সম্প্রদায়ের মহিলাদের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য সংগঠিত করতে থাকে। এর ফলে মুসলিম নারীদের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংখ্যায় অল্প হলেও মুসলিম নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত করে যে, মেয়েদের স্ত্রী ও মায়ের প্রাথমিক ভূমিকা পালন করার বাইরেও এক বিরাট জগৎ আছে। যেখানে তাদের বিরাট ভূমিকা পালন করতে হবে। জীবন বহির্জগতের ধারণা, নিজ ভাবমূর্তি, ব্যক্তিত্ব ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ পরিবর্তনশীল মুসলিম সমাজে তাদের গতিশীল কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য বহন করে। [অন্দরমহল থেকে রাজপথে ঃ ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম, পৃ. ২১১][৮১]

আধুনিক শিক্ষার আলোকে নারী আজ নিজেকে কিছুটা আলোকিত করে সেই শৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে বের করে এনে আলোর দিশা দেখানোর চেষ্টা করে চলেছে। নারীর আত্মার জাগরণ না হলে সমাজে নারী সম্প্রদায়ের জাগরণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ 'নারীকে দিতে হবে তার যোগ্য সম্মান', না হলে সমাজের অগ্রগতিও সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থান আজও অন্ধকারে। সে আজও কারো কন্যা, কারো জায়া, কারো মাতা এই পরিচয়ে বেশি সমৃদ্ধ। নারী সত্তার জাগরণ আজও সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেনি। তাই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশক থেকে শুরু করে বর্তমানে শূন্য দশকে নারীরা আজ সরব হতে চাইছে তার পাওয়া-না পাওয়ার বিরুদ্ধে। সে আজ সাবলম্বী, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, তাও কোথাও যেন সে পুরুষতন্ত্রের দ্বারা চালিত। এক্ষেত্রে স্মরজিৎ জানার প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন উল্লেখ করতে হয়—

> বলা বাহুল্য, এই সামাজিক পরিবেশে সাংস্কৃতিক ব্যবসায় মেয়েদের নিজস্ব যৌনতার কোনোজায়গাই প্রায় নেই। তাদের শরীর ঢাকতে হয় পুরুষের ভয়ে। আবার শরীর খুলে দেখাতেও হয় পুরুষের মনোরঞ্জনে। আজকের বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসের ক্রেতা হিসেবে মেয়েদের দেখা যাচ্ছে। একদিকে কিছুটা স্বাধীনতার আভাস মিললেও এই ভূমিকা অনেক অংশে পুরুষনির্দিষ্ট এবং পণ্য ও ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর....। ['যৌনতা ও সংস্কৃতি', 'যৌন কাজ কি কাজ' পৃ. ৩৪১][৮২]

আপাত দৃষ্টিতে নারীকে দেখে মনে হয় যে, নারী আজ স্বাধীন। কিন্তু নারী আজও পুরুষের পদানত। সমাজের উঁচুতলা থেকে নীচুতলা পর্যন্ত সব জায়গাতেই পুরুষের দেওয়া স্বাধীনতার মুখোশ পড়ে নারী আজ আনন্দিত ও উল্লসিত। বর্তমানে সমাজের উঁচুতলার শিক্ষিত মানুষেরা ফেমিনিজম নিয়ে বড়ো বেশি লাফালাফি শুরু করেছে। আজ যেদিকে কান পাতা যায় সেদিক থেকেই ভেসে আসে 'নারী স্বাধীনতা', 'নারীর ন্যায্য অধিকার' প্রভৃতি বিষয়ের মতো স্লোগান। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েই চলেছে। কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থান আজও অন্ধকারে। সে আজও কারো কন্যা, কারো জায়া, কারো মাতা এই পরিচয়ে বেশি সমৃদ্ধ। নারী যতদিন পর্যন্ত নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেনি এবং পুরুষের মনোরঞ্জনে ও ভোগের সামগ্রী হিসেবে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে ততদিন পর্যন্ত সমাজে নারীকে নিয়ে কোনো গোলমাল বাঁধেনি। যখনই এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে তখন থেকে অন্ধকার যুগের প্রভুত্ব কামনাকারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হিংস্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লেগেছে। তাই দিকে দিকে নারী আজ ধর্ষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত। অন্যদিকে তীব্র লোভ, মোহ, ঈর্ষা যা নারীকে গড্ডালিকা প্রবাহের দিকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রবাহ থেকে নারীর মুক্তির প্রধান সহায় হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষাই পারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের মধ্যেকার চেতনার জাগরণ বা উন্মেষ ঘটাতে। তাছাড়া প্রকৃত শিক্ষাই পারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভেদের রেখাকে ঘোচাতে। সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষ সম্প্রদায়কেই প্রকৃত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই একটি সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. হুমায়ুন আজাদ, নারী (মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্ ঞ্ঝ অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দু) প্রতম প্রকাশ ফাধন ১৩৯৮ ঞ্ঝ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃ. ২৬৮। (অতঃপর গ্রন্থটি হুমায়ুন আজাদ 'নারী' নামে উল্লিখিত হবে।)

২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬১।

৩. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ (বৈদিক যুগে নারী) প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৬ (দ্বিতীয় প্রকাশ) জুলাই ২০১০, প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১২ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃ. ৭।

৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১।

৫. ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি। প্রথম সংস্করণ ঞ্ঝ নভেম্বর ১৯৪৪ (চতুর্থ সংস্করণ) জানুয়ারী ২০০২ ;প্রকাশক, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা, ৭০০ ০৭৩। পৃ.

৬. হুমায়ুন আজাদ—নারী (ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার, ও মনোবিশ্লেষণাত্মক সমাজবৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়াশীলতা) প্রথম প্রকাশ ফাধন ১৩৯৮ ঞ্ঝ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, প্রকাশক ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০ পৃ. ১৫৩।

৭. আনোয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১, প্রথম প্রকাশ ঞ্ঝ মে, ২০০৬ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ; জুন, ২০১৪, প্রগতিশীল প্রকাশক, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১২।

৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩।

৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬।

১০. হুমায়ুন আজাদ—নারী (ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার, ও মনোবিশ্লেষণাত্মক সমাজবৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়াশীলতা) প্রথম প্রকাশ ফাধন ১৩৯৮ ঞ্ঝ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, প্রকাশক ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০ পৃ. ১৫৯।

১১. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ২৬৭।

১২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫২।

১৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৪।

১৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৪।

১৫. সমগ্রন্থ-পৃ২৫৪-২৫৫।

১৬. সমগ্রন্থ-পৃ. ৫৯।

১৭. গৌরকিশোর ঘোষ, জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৭৮, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৪০।

১৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪০।

১৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪।
২০. গৌরকিশোর ঘোষ-প্রতিবেশী। প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ৬৪।
২১. গৌরকিশোর ঘোষ জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৭৮, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১১৯-১২০।
২২. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৮।
২৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭৫।
২৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭৬।
২৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১১।
২৬. আনোয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১, প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ২০০৬ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত) দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন-২০১৪, প্রগতিশীল প্রকাশক, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৭।
২৭. গৌরকিশোর ঘোষ—প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ২।
২৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬।
২৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬।
৩০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৩।
৩১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৩।
৩২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬।
৩৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯।
৩৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৫।
৩৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৯।
৩৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১০৭।
৩৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১০৭।
৩৮. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ২১৯।
৩৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৯।
৪০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২০।
৪১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৯।
৪২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৫।
৪৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৫।
৪৪. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ২।
৪৫. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ১২১।
৪৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৯-২৬০।
৪৭. শিবনাথ শাস্ত্রী-রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ) প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯০৪, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯গ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. ৯২সি. রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা ৮০০ ০৯২, ৮ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১২৫।
৪৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৫।
৪৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৫।
৫০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৫।
৫১. সমগ্রন্থ, পৃ. .....।
৫২. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ১৮৪।
৫৩. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র (সাগিনা মাহাতো) প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ২০৪।
৫৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২০৪।
৫৫. সমগ্রন্থ পৃ. ২০৫।

৫৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২০৬।
৫৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৫।
৫৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৫।
৫৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৭।
৬০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩৪।
৬১. যশোধরা বাগচী, পরিযায়ী নারী ও মানবাধিকার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১৪, সেতু প্রকাশনী, ১২/এ, শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬। পৃ. ২১-২২।
৬২. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ (মনের বাঘ), প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩।
৬৩. গৌরকিশোর ঘোষ—গল্প সমগ্র (জবানবন্দী), প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৪৯-১৫৩।
৬৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৪১।
৬৫. মণিকুন্তলা সেন, জনজাগরণে নারী জাগরণে (সেদিনের কথা/গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশন ঃ বিশ্বনারী সংঘ পৃ. ২১৩), থীমা ২০১০, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬ কর্তৃক প্রকাশিত।
৬৬. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৭৮।
৬৭. গৌর কিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র (শিকার) প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়োটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৯০।
৬৮. মণিকুন্তলা সেন, জনজাগরণে নারী জাগরণে (সেদিনের কথা/প্রসঙ্গ ঃ গণ আন্দোলন, পৃ। ২২৫), সীমা ২০১০, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬ কর্তৃক প্রকাশিত।
৬৯. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৬০।
৭০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬০।
৭১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬৩।
৭২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬২।
৭৩. মণিকুন্তলা সেন, জনজাগরণে নারী জাগরণে (সেদিনের কথা/শেষকথা, পৃ. ২৮০), থীমা ২০১০, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬ কর্তৃক প্রকাশিত।
৭৪. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৫৫।
৭৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৯।
৭৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৭৩-৭৪।
৭৭. গৌরকিশোর ঘোষ, জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, মে ১৯৭৮, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৮৫।
৭৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯১।
৭৯. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৩৪২।
৮০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪১।
৮১. আনোয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১, প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ২০০৬ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০১৪, প্রগতিশীল প্রকাশ, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২১১।
৮২. সুধীরকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত ঃ যৌনতা ও সংস্কৃতি ঃ স্মরজিৎ জানার প্রবন্ধ যৌন কাজ কি কাজ পৃ. ৩৪১।